প্রকাশক : গৌরাঙ্গ সান্যাল। সান্যাল প্রকাশন
১৬ নবীন কুণ্ডু লেন। কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৯৬০।

মুদ্রক : জয়গুরু প্রিন্টার্স
৪এ, বৃন্দাবন বোস লেন। কলিকাতা-৬

আমার শ্রুতি বন্ধুদের

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় □ সুখেন্দু রায়

শিবনাথ আচার্য্য □ পারমিতা মুখোপাধ্যায়

সুশংকর কুণ্ডু

লেখকের অন্যান্য বই
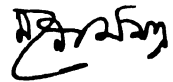
- শিরদাঁড়া সোজা রাখুন
- কী করবেন! চুল পড়ছে, ভুঁড়ি বাড়ছে
- বার্ধক্যের নানা রং
- শরীর স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা
- সুখে থাকবেন না অসুখে
- রোগটা যখন ক্যানসার
- শরীর ঘিরে বিপত্তি
- শরীরের নাম মহাশয়
- শরীর নিয়ে কত কথা
- গৃহিণীরা শুনছেন
- রোগ দুর্ভোগ
- বিষয় : কান নাক গলা
- জেনে রাখলে ক্ষতি কি!
- রান্না খাওয়া পুষ্টি
  [সহলেখিকা : ধৃতিকণা ভট্টাচার্য]

নাটক

- এক ডজন শ্রুতিনাটক
- হাফ ডজন শ্রুতিনাটক
- একগুচ্ছ শ্রুতিনাটক
- প্রতি রাতে সে আসে
- বড়বাবুর বাঘ শিকার
- জীবনের খোঁজে
- এক যে ছিল ভূত

নট ও নাট্যকার মনোজ মিত্রের কলমে

কসমেটিক সার্জারি ফিরিয়ে আনতে পারে একজন মানুষের আবয়বিক সৌন্দর্য, আপাত নিরীহ কতো না কারণে শরীরে নিঃশব্দে ঘটে যায় এড্‌স রোগের সংক্রমণ, প্রথম পর্যায়ে ধরা পড়লে ক্যানসার মোটেই দুরারোগ্য নয়—এমনি কয়েকটি গুরুতর জ্ঞাতব্য নিয়ে লেখা ডা. অমিতাভ ভট্টাচার্যের ৫টি শ্রুতিনাটক ও ১টি চিত্রনাটক। লেখক এই শহরের অতিব্যস্ত ডাক্তার—নাটকে আছে জরুরি সব ডাক্তারি পরামর্শ-প্রশ্ন উঠতে পারে নাটকগুলি কি সৃজনমূলক রচনা হিসেবে গণ্য হবে? শিল্পতত্ত্বের বহু আলোচিত বিতর্ক : কোনো দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক বা তাত্ত্বিক যখন শাস্ত্রীয় কোনো প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করতে গল্প বা নাটক লিখবেন—অর্থাৎ কাহিনীর মাধ্যমে তাঁর তত্ত্ব বা সিদ্ধান্তকে দাঁড় করবেন—তখন তাঁকে কি দেওয়া যেতে পারে গল্পকার বা নাট্যকারের মর্যাদা? বিতর্কের মীমাংসা যাই হোক, অমিতাভের সবকটি রচনাই যে হৃদয়সঞ্জাত কল্পনার ফসল—তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। কাহিনী বুননে, ঘটনা সঙ্ঘটনে, রসসৃজনে, নাট্যমুহূর্ত এবং মানব চরিত্র নির্মাণে, সর্বোপরি আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট গঠনে নাট্যকার অমিতাভ ভট্টাচার্য যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তা কেবল বোধে এবং কল্পনার যথার্থ মেল বন্ধনেই মেলে। দর্শক পাঠককে মুগ্ধ করার সব গুণ আছে তাঁর কলমে। বাড়তি যেটা পাওয়া, জরামৃত্যুব্যাধি বিষয়ে সচেতনতা। একবিংশ শতাব্দীতে তথ্যপ্রযুক্তির জয়যাত্রা। অমিতাভ ভট্টাচার্যের নাটকগুলি বাংলা মঞ্চে অভিনব সংযোজন। নাট্যকারকে অভিনন্দন।

মনোজ মিত্র

নাট্যকারের কলমে

শ্রুতি নাটক চিত্রনাটক। নামটা একটু অভিনব লাগছে হয়তো। শ্রুতিনাটকের সঙ্গে তো বিলক্ষণ পরিচয় আছে। কিন্তু চিত্রনাটক! সে আবার কী বস্তু? চিত্রনাটক না বলে যদি চিত্রনাট্য বলি, ব্যাপারটা কিছুটা বোধগম্য হয়। সিনেমা বা দূরদর্শন ধারাবাহিক যে পাণ্ডুলিপি অনুসরণ করে তৈরি হয়, যাতে চিত্র ভাবনাও থাকে আবার সংলাপ নির্ভর নাটকও থাকে, সেটাই হল চিত্রনাট্য ওরফে চিত্রনাটক। যা আলাদাভাবে পাঠ করলে চোখের সামনে একটা ছবিও আস্তে আস্তে যেন তৈরি হতে থাকে।

এবার প্রশ্ন, শ্রুতিনাটকের আসরে হঠাৎ চিত্রনাটকের অনুপ্রবেশ কেন? মূলত দুটোই নাটক। কিন্তু একটির স্থান মঞ্চ বা বেতারবাহী হয়ে শ্রোতার কানে আর আরেকটি বড় বা ছোট পর্দাবাহী হয়ে শ্রোতা-দর্শকের চোখে। তাহলে এই দুই মাধ্যমের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কেন আমার এই সংকলনে, প্রশ্ন উঠতেই পারে।

'রিক্তাকে নিয়ে চিঠি' আমার লেখা 'এক ডজন শ্রুতিনাটক' বইটির একটি জনপ্রিয় নাটক। স্বনামধন্য পার্থ ঘোষ-সহ বহু শ্রুতি ব্যক্তিত্ব এককভাবে বা সহশিল্পী নিয়ে এটি পরিবেশন করেন ও যথারীতি বাহবাও পান। একটি প্রাইভেট টিভি চ্যানেল এটিকে পছন্দ করে তার চিত্রনাট্য লেখার অনুরোধ করেন আমাকে। আমি অনুপ্রাণিত হয়ে লিখি এবং শ্রুতিনাটকের ছোট্ট ক্যানভাস তার ডালপালা ছড়িয়ে এখানে একটি বিশাল বর্ণময় ক্যানভাসে রূপান্তরিত হয়। এটি যখন সুধীজনের সামনে পাঠ করি, তখন আশ্চর্য হয়ে দেখি এই বিশাল ক্যানভাসটিও তাঁদের ভাল লাগছে। ভাল লাগবে আপনাদেরও, এই আশায় এই সংকলনে এটিকে রাখলাম। একটু বৈচিত্র্যও আসবে হয়তো। ভাল লাগলে ঝুঁকি নিয়ে ঘরোয়া আসরে একক পাঠ করতেও পারেন। সংকলনটি কেমন লাগল, জানাবেন আশা করি। যাঁরা নাটকগুলো পরিবেশন করবেন, জানাতে পারেন, না জানালেও ক্ষতি নেই। সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ।

সূচিপত্র

- শেষের সেদিন ৯
- লটারি পাবার পরে ১৮
- নিঃশব্দ বিষ ২৮
- অসুখ ৪৩
- নতুন আলো ৫৩
- রিক্তাকে নিয়ে চিঠি ৫৭

শেষের সেদিন

চরিত্র ❑ টিনা ।। সঞ্জয় ।। ডাঃ সান্যাল

[*মুখোমুখি দুটো গাড়ির অ্যাক্সিডেন্টের সাউন্ড এফেক্ট। কোলাহল। একটু বাদে ফোন বেজে ওঠার শব্দ। রিসিভার তোলার শব্দ।*]

টিনা।। হ্যাঁ, বলুন। হ্যাঁ, আমি টিনা চৌধুরী বলছি। হ্যাঁ, আপনি ঠিক নম্বরেই করেছেন। অ্যাক্সিডেন্ট। সঞ্জয়ের। কী বলছেন আপনি। হেড ইনজুরি নয়তো। হ্যাঁ, ওই নার্সিংহোম আমি চিনি। আমি এক্ষুনি আসছি, এক্ষুনি।

[*সাসপেন্স মিউজিকে দৃশ্যান্তর। কলিংবেল বেজে ওঠার শব্দ।*]

ডাঃ সান্যাল।। কাম ইন।

টিনা।। ডাক্তারবাবু, আমি ৭২ নম্বর বেডের পেসেন্টের ব্যাপারে আপনার সাথে একটু কথা বলতে এসেছি।

ডাঃ সান্যাল।। হ্যাঁ বলুন। আরে তুমি ডাঃ বোসের মেয়ে টিনা না! বসো বসো—

টিনা।। আঙ্কল আপনি! আমি তো ভাবতেই পারিনি যে আপনাকে এখানে—এভাবে—

ডাঃ সান্যাল।। আমি তো স্টেট্‌স থেকে গতমাসে ফিরে এখানে জয়েন করেছি।

টিনা।। আমাদের ভুলেই গেছেন—

ডাঃ সান্যাল।। একদম না। টেলিফোন ডিরেক্টরি খুঁজে খুঁজে সব বন্ধুবান্ধবদের ফোন নম্বর জোগাড় করেছি। কিন্তু তোমাদের ফোন নম্বর—

টিনা।। বাবা মারা যাবার কিছুদিন বাদে টেলিফোন ডিসকানেক্ট করে দিয়েছিলাম।

ডাঃ সান্যাল।। বৌদি ভাল আছেন?

টিনা।। হ্যাঁ।

ডাঃ সান্যাল।। তুমি কী করছ?

টিনা।। একটা প্রাইভেট কনসার্নে সেলসে আছি।

ডাঃ সান্যাল।। বৌদিকে বোলো, আমি এর মধ্যে একদিন যাব। বলো, কোন পেসেন্টের ব্যাপারে কী জানতে চাইছ?

টিনা।। ৭২ নম্বর বেডের পেসেন্ট। সঞ্জয় বোস। স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট। সপ্তাহ তিনেক এখানে ভর্তি আছে। ডাঃ সরকার দেখছেন। উনি শুনলাম আপনাকে রেফার করেছেন।

ডাঃ সান্যাল।। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি এখনও দেখিনি—বেড টিকিটটা সিস্টারকে আনতে বলেছি। মুখে অনেকগুলো ডিফরমিটি হয়েছে শুনলাম—

টিনা।। প্ল্যাস্টিক সার্জারি করলে ঠিক হয়ে যাবে তো!

ডাঃ সান্যাল।। হোয়াই নট! তবে পেসেন্ট আগে দেখে নিই, তারপর তোমাকে ডিটেল্‌সে সব বুঝিয়ে দেব। এত ওরিড হবার কিছু নেই। ক্রাইসিস পিরিয়ড তো কেটে গেছে—

টিনা।। তা গেছে—কিন্তু আঙ্কল, ওর মুখ কি আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে যাবে?

ডাঃ সান্যাল।। নিশ্চয়ই। হয়তো আগের থেকে আরও বেটারও করে দিতে পারি। যা তুমি চাইবে। চলো, আমার সাথে ওয়ার্ডে চলো। পেসেন্ট দেখার পর বাকি কথা হবে।

[*দৃশ্যান্তর বোঝাতে আবহসঙ্গীতের প্রয়োগ হবে।*]

টিনা।। গুড মর্নিং জয়। মে আই কাম ইন?

সঞ্জয়।। এসো।

টিনা।। শুধু এসো। আর কিছু নয় সঞ্জয়বাবু।

সঞ্জয়।। আর কী বলব—

টিনা।। কাম ইন টিনা—ওয়েলকাম, মোস্ট ওয়েলকাম—ভেরি গুডমর্নিং—কত কিছুই তো বলা যেত।

সঞ্জয়।। এই পোড়া মুখে—যত ভাল কথা বলি না কেন—কোনও কিছুই তোমার ভাল লাগবে না—

টিনা।। এভাবে বলছ কেন? এতবড় একটা বিপদ থেকে বেঁচে ফিরেছ—এটাই তো সবথেকে বড় কথা। মুখের ঘা গুলো প্রায় শুকিয়ে এসেছে। কদিন বাদেই প্ল্যাস্টিক সার্জারি করে ডক্টর আঙ্কল সব ঠিক করে দেবেন।

সঞ্জয়।। জানি। একেবারে নতুন মুখ হয়ে যাবে আমার। পুরনো জয়ের খোলস ছেড়ে আরেকটা নতুন জয় জন্ম নেবে।

টিনা।। হ্যাঁ, ডাঃ সান্যাল জাদু জানে। তাছাড়া প্ল্যাস্টিক সার্জারিতে আজকাল কি-ই না হচ্ছে। খ্যাঁদা নাক উঁচু হচ্ছে, চোখের তলার ফোলা অংশ চেঁছে-পুছে সমান করে দিচ্ছে, ভুঁড়ি পর্যন্ত ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে। হোয়াট এ মিরাক্যুলাস অ্যাডভান্সমেন্ট অব মেডিকেল সায়েন্স।

সঞ্জয়।। টিনা, তুমি তাহলে কনফার্মড যে আমার এই পোড়ামুখ আবার আগের মতো হয়ে যাবে?

টিনা।। শুধু আগের মতো নয়, আগের চেয়ে হয়তো অনেক ভালই হবে।

সঞ্জয়।। আগের থেকে ভাল হবে মানে?

টিনা।। মানে—এত টাকা খরচ করে যখন এই কসমেটিক সার্জারি হচ্ছেই তখন তোমার অন্য ফেসিয়াল ডিফেক্টসগুলোও এই সুযোগে কারেকশন করিয়ে নেব।

সঞ্জয়।। ফেসিয়াল ডিফেক্টস্!

টিনা।। হ্যাঁ,—দো ভেরি মাইনর—স্টিল—

সঞ্জয়।। স্টিল!

টিনা।। এই দেখো জয়—তুমি কিন্তু ভীষণ সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছ।

সঞ্জয়।। নট অ্যাট অল। আমি শুধু জানতে চাইছি। কারণ মুখটা তো আমার।

টিনা।। পরে জানলে অসুবিধে কি। ডাক্তারবাবু অনেকগুলো ড্রইং করিয়ে আনবেন আর্টিস্টকে দিয়ে। একটা বেছে নিলেই হল। জাস্ট হ্যাভ টু চুজ এনিওয়ান।

সঞ্জয়।। তুমি তো আমার সাথে দুবছর মিশছ টিনা। তুমি ছাড়া আমাকে এত ভাল আর কেউ বাসে না, তোমার মতো এতকরে আমায় আর কেউ চেনে না—তাই জিজ্ঞেস করছি।

টিনা।। বাট ইউ হ্যাভ টু টেক এভরিথিং স্পোর্টিংলি।

সঞ্জয়।। এগ্রি।

টিনা।। জয়, তোমার মুখের সব ঠিক আছে। অমন টানা চোখ, টিকোলো নাক—দেখলে যে কারও প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করবে। কিন্তু তোমার হাঁ-মুখটা বড্ড ছোট জয়। যখন তুমি আনন্দে, আবেগে, উত্তাপে প্রাণখুলে হাসতে থাক—আমার কেমন বীভৎস লাগে—ভীষণ আগলি লাগে—আই কান্ট স্ট্যান্ড ইউ ফর দ্যাট ভেরি মোমেন্ট জয়—আই কান্ট স্ট্যান্ড ইউ।

সঞ্জয়।। দ্যাটস্ অল। নাথিং মোর?

টিনা।। হাসিই তো একটা মানুষের ব্যক্তিত্বের অন্যতম পরিচয় জয়। অথচ তুমি যখন হাসতে থাক—

সঞ্জয়।। তুমি কি আমার কাছে উত্তমকুমারের মত ভুবনভোলানো হাসি আশা কর?

টিনা।। না—তা ঠিক নয়—কিন্তু—কী করে তোমাকে যে বোঝাই। তাছাড়া তোমার এভাবে অ্যাক্সিডেন্ট না হলে তো এসব প্রশ্ন আসতোই না—রিকনস্ট্রাকশন যখন হচ্ছেই—দেন জাস্ট টু হ্যাভ এ চান্স।

সঞ্জয়।। তুমি আমায় খুব ভালবাস—তাই না টিনা।

টিনা।। তোমার সন্দেহ আছে বুঝি!

সঞ্জয়।। সন্দেহ করার কোনও সুযোগ তো তুমি রাখনি টিনা। অ্যাক্সিডেন্টের খবর পেয়েই ছুটে এসেছ। আগের নার্সিংহোম থেকে আমায় নিয়ে এসে ভর্তি করেছ এই বড় নার্সিংহোমে। বড় বড় ডাক্তার দেখিয়ে, ওষুধে, সেবায়, যত্নে প্রাণে বাঁচিয়েছ। তোমার জন্যই আমি নতুন জীবন ফিরে পেয়েছি টিনা। শুধু আয়নায় এই বীভৎস মুখটা দেখে

সেদিন মনে হয়েছিল, কেন বাঁচলাম!

টিনা।। আবার ওসব কথা। মুখের সব ঘা তো প্রায় শুকিয়ে গেছে। আর কয়েক সপ্তাহ বাদেই—

সঞ্জয়।। আমার মুখের রিকন্সস্ট্রাকশান হবে। কসমেটিক সার্জারি। হাঁ, মুখটাকে বড় করা হবে, যাতে হাসবার সময় তোমার আর আগলি না লাগে—

টিনা।। শুধু আমার চোখে নয়, আমাদের বাড়ির সবার চোখেই—ওইতো সেদিন শুক্লা বলছিল—

সঞ্জয়।। মুখের আমি, মুখের তুমি, মুখ দিয়ে যায় চেনা—(বিষণ্ণ হাসি হাসে)

টিনা।। এই যা—কথায় কথায় সোয়া দশটা বেজে গেল। আঙ্কল দশটায় দেখা করতে বলেছিলেন। জয়, আমি চট করে ঘুরে আসছি। ফ্লাস্কে স্যুপ আছে। খেয়ে নাও। আমি এসে তোমার সাথে গল্প করব! বাই—

[*দৃশ্যান্তর বোঝাতে আবহসঙ্গীতের প্রয়োগ হবে।*]

ডাঃ সান্যাল।। ব্যাপারটা সিরিয়াসলি ভেবে দেখেছ তো টিনা?

টিনা।। অনেকবার ভেবেছি। সঞ্জয়কেও বলেছি।

ডাঃ সান্যাল।। ও কী বলল?

টিনা।। কী আবার বলবে। আমার ওপরেই ছেড়ে দিয়েছে। আর আমি ছেড়ে দিয়েছি আপনার ওপরে।

ডাঃ সান্যাল।। কিন্তু তুমি যা চাইছ তেমনটি যদি না হয়—

টিনা।। হবেই। আপনার অ্যালবামের ছবিগুলো আমি দেখেছি। আপনার হাত শিল্পীর হাত। আপনি পারবেনই আঙ্কল। আপনাকে তো আমি বহুদিন চিনি। আপনি আমার কাছে ভগবান।

ডাঃ সান্যাল।। ডাক্তারি শাস্ত্রে আবেগের কোনও স্থান নেই টিনা। যুক্তিটাই আসল। সঞ্জয়ের মুখে গোটা তিনেক মাইনর ডিফরমিটি হয়েছে। ওগুলো সহজেই আমি কারেকশন করে দেব। অ্যাক্সিডেন্টের আগে ওর মুখের যে চেহারা ছিল, প্রায় সেই চেহারাই ফিরে পাবে ও। কিন্তু নতুন করে—

টিনা।। আপনি আমার প্রবলেমটা বুঝতে পারছেন না আঙ্কল। আপনাকে তো কতবার বলেছি, ওর ওই আগলি হাসিটা আমি একদম সহ্য

করতে পারি না। অনলি দ্যাট ভেরি মোমেন্ট আই কান্ট স্ট্যান্ড হিম। নইলে জয়ের আর সবকিছু সুন্দর। আসলে আপনি—

ডাঃ সান্যাল।। খোদার ওপর খোদকারি করে সবসময়ে কিন্তু জেতা যায় না টিনা। তুমি আমার কলিগ ডাঃ চৌধুরীর মেয়ে। আমার মেয়ের মতোই। তাই তোমায় বলছি আরেকবার ভেবে দেখতে। অন্য কেউ এমন রিকোয়েস্ট করলে আমি তক্ষুনি রিফিউজ করতাম। বাট য়ু আর র‍্যাদার ডিফরেন্ট।

টিনা।। ভাবাভাবির আর কোনও প্রশ্নই নেই আঙ্কল। আমি জয়কে রাজি করিয়েছি। আপনি আর আপত্তি করবেন না। আই কিপ কনফিডেন্স অন ইউ। প্লিজ আঙ্কল.....

ডাঃ সান্যাল।। ওকে। তবে একটা শর্ত আছে। অপারেশনের পর অন্তত সপ্তাহ তিনেক তুমি ওকে মিট করতে পারবে না। জাস্ট টু অ্যাভয়েড একসাইটমেন্ট অন বোথ অব ইওর পার্টস। তুমি রাজি?

টিনা।। হ্যাঁ, আমি রাজি।

[*দৃশ্যান্তরে আবহসঙ্গীতের প্রয়োগ হবে।*]

টিনা।। কনগ্র্যাচুলেশন জয়। না, আজ আর চিঠি নয়, আমি নিজেই এসেছি জয়। দেখ, তোমার জন্য কি সুন্দর এই বোকেটা এনেছি। গোলাপ তোমার ভারি পছন্দ, তাই না। লাইলাক রঙটাও তোমার খুব প্রিয়, তাই লাইলাক রঙের শাড়ি পরেছি আজ। জয়, মুখ তুলে তাকাও আমার দিকে। তাকাও। বাঃ, কী সুন্দর লাগছে তোমাকে। তিন সপ্তাহ পর তোমায় দেখছি তো—মনে হচ্ছে আমার আগের জয়ের বুঝি নবজন্ম হল।

কথা বলছ না কেন জয়? রাগ করেছ, তাই না। আমি তো তোমায় চিঠি লিখে সবই জানিয়েছি। ডক্টর আঙ্কল বলেছিলেন, অপারেশনের পর আমি যেন তোমার থেকে কিছুদিন দূরে থাকি। আমাকে দেখেই তুমি কথা বলতে চাইতে—হঠাৎ কোনও ইমোশনাল আউটব্রেক—তাই তো আমি আসিনি। শুধু চিঠি লিখেই.....। জয়, প্লিজ, আমার সাথে কথা বলো। এই তিন সপ্তাহ তোমায় ছেড়ে থাকতে আমার যে কি কষ্ট হয়েছে, তা শুধু আমিই জানি। তোমারও ভীষণ কষ্ট হয়েছে, তাই না। কিন্তু এবার তো আমি এসে গেছি।

আঙ্কলের আঙুলের ছোঁয়ায় তোমার মুখের সব ডিফরমিটিগুলো কেমন ভ্যানিশ হয়ে গেছে। সেই চোখ, নাক, চিবুক—কেমন মিষ্টি দুটো ঠোঁট। তোমাকে আমার ভীষণ আদর করতে ইচ্ছে করছে। জয়, একটু কথা বলো আমার সঙ্গে, একটু হাসো—জাস্ট হ্যাভ এ স্মাইল—(জয় ধীরে ধীরে হাসতে শুরু করে) হ্যাঁ, এইতো। আমার জয় আবার হাসছে। নতুন মুখে নতুন করে হাসছে। আমার জয়—

আমার—(জয়ের হাসি বাড়তে থাকে) একি জয়! তুমি ওভাবে হাসছ কেন? আঃ কি ভয়ংকর লাগছে তোমাকে·····কি বীভৎস·····বন্ধ কর জয়, এ হাসি বন্ধ কর। (জয়ের হাসি বীভৎসতার চূড়ান্ত পর্যায়ে) এ আমি চাইনি জয়—তোমার ওই মুখ যেন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মতো হয়ে উঠছে—আমায় গিলে খেতে চাইছে·····আমি সহ্য করতে পারছি না। আঃ কি বীভৎস·····নারকীয়·····বন্ধ কর জয়·····আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমি এ চাইনি জয়·····এ আমি চাইনি। (কান্নায় গলাা বুজে আসে) ডক্টর আঙ্কল আপনি কোথায়·····আমার জয়ের আগের মখ. আগের সেই হাসি আবার ফিরিয়ে দিন। আপনি শুনতে

পাচ্ছেন না.....আমার জয়ের আগের হাসি আবার ফিরিয়ে দিন.....(বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ে)

ডাঃ সান্যাল।। আই অ্যাম হিয়ার টিনা, জাস্ট বিহাইন্ড য়ু।

টিনা।। আঙ্কল, এ আপনি কী করলেন!

ডাঃ সান্যাল।। কেন! তুমি যা চেয়েছ তাই করেছি। জয়ের মুখের রিকনস্ট্রাকশন করে ওর হাসি পর্যন্ত পাল্টে দিয়েছি।

টিনা।। দিয়েছেন, কিন্তু আমি তো এ হাসি চাইনি। ও কি বীভৎস! যেন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের হাসি।

ডাঃ সান্যাল।। কেন! আমার তো ভালই লাগছে। আগে তো ও মুখ বুজে হাসতো— আর এখন কেমন হা হা-হো হো—একেবারে প্রাণখোলা হাসি। আমাদের সবার তো দারুণ লাগছে। (জয় আবার বীভৎসভাবে হেসে ওঠে)

টিনা।। জয়, তোমার পায়ে পড়ি। ওভাবে আর হেসো না—আমি সহ্য করতে পারছি না।

ডাঃ সান্যাল।। দেখতে দেখতে নিশ্চয়ই সয়ে যাবে। আর তুমি তো জয়ের মধ্যে যে মানুষটা আছে তাকে ভালবাস—শুধু ওর হাসিটাকে নয়।

টিনা।। না-না-এ হয় না। কেন আপনি আমাকে বারণ করলেন না। কেন আমার এ অন্যায় জেদ আপনি মেনে নিলেন?

ডাঃ সান্যাল।। বারণ তোমায় বহুবার করেছি টিনা। তুমি শোননি, উল্টে আমার ওপর জোর করেছ।

টিনা।। আপনি কেন আমাকে বকলেন না, মারলেন না। আমার এই মোহের ফানুসটাকে ফুটো করে দিলেন না—

ডাঃ সান্যাল।। তুমি তাহলে স্বীকার করছ যে পুরো ব্যাপারটাই তোমার মোহ ছিল।

টিনা।। জানি না—আমি কিচ্ছু জানি না। আপনি শুধু আমার জয়ের সেই আগের হাসিটাকে ফিরিয়ে দিন। প্লিজ আঙ্কল—

ডাঃ সান্যাল।। তা কী করে হবে। আমি কি ম্যাজিক জানি? তবে.....

টিনা।। তবে কী?

ডাঃ সান্যাল।। তবে.....আচ্ছা টিনা, তুমি তো জয়কে খুব ভালবাস। তাই না—

টিনা।। আপনি আমাদের এতদিন দেখার পরও এই প্রশ্ন করছেন আঙ্কল?

ডাঃ সান্যাল।। না, মানে সত্যিকারের ভালবাসা, আই মিন ট্রু লাভ অনেক সময় মিরাকেল ঘটাতে পারে। ভালবাসার অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে তোমায়। তুমি কি রাজি?

সঞ্জয়।। ডাক্তারবাবু, অনেক শাস্তি দিয়েছেন। এবার ওকে রেহাই দিন।

ডাঃ সান্যাল।। দিলে তো মাঝপথে ক্লাইম্যাক্সটা নষ্ট করে।

টিনা।। একি! তুমি—মানে আপনি কে!

সঞ্জয়।। আমি সঞ্জয়—তোমার আদরের জয়।

টিনা।। তা কী করে হবে! দুপাশে দুজন জয়। আমি কি ভুল দেখছি। আমার সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে—

ডাঃ সান্যাল।। তুমি ঠিকই দেখছ টিনা। তবে একজন জয় আসল—যে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আরেকজন জয় হল নকল—যে ওই বেডে বসে আছে। কাম অন অভীক। রিমুভ ইওর মেকাপ।

টিনা।। হাউ স্ট্রেঞ্জ!

ডাঃ সান্যাল।। অভীক আমার ভাইপো। গ্রুপ থিয়েটারে নিয়মিত অভিনয় করে। রবীন্দ্রভারতীতে মেকাপ নিয়ে কাজ করছে। এছাড়া ভাল ছবিও আঁকে। আমার প্রবলেম শুনে ও নিজেই এই অ্যাকটিং করার ঝুঁকিটুকু নিয়েছিল। অ্যান্ড নাউ দ্য প্রবলেম ইস সল্‌ভড।

টিনা।। আঙ্কল-আঙ্কল—আমি যে কী বলে আপনাকে—আই অ্যাম রিয়েলি গ্রেটফুল।

ডাঃ সান্যাল।। আরে-আরে—প্রণাম করার কী হল! পাগলি কোথাকার। আমি শুধু জয়ের মুখের ছোট ডিফেক্টসগুলোই ঠিক করে দিয়েছি। হাসিটাকে পাল্টানোর চেষ্টা করিনি। সেটা সম্ভবও নয়। প্রকৃতির বিরুদ্ধস্রোতে সাঁতার কাটতে গেলে ডুবে যাবার সম্ভাবনাও থাকে। জয়·হেসে একবার দেখিয়ে দাও তো, যে তুমি সত্যিই সেই আগের জয় কি না।

[*জয়ের সঙ্গে সকলেই হেসে ওঠে। নাটক শেষের আবহসঙ্গীত ভেসে আসে।*]

লটারি পাবার পরে

চরিত্র ❑ সূর্য ।। দীপা ।।

[*নেপথ্য আবহসঙ্গীত বিয়েবাড়ির সানাইয়ের সুর ভেসে আসে। ফুলশয্যার রাত।*]

সূর্য।। সবার জীবনেই এ রাতটা শুধু একবারের জন্যই আসে, তাই না দীপা।

দীপা।। আসে হয়তো—তবে আমাদের জীবনে এভাবে না এলেই ভাল হত।

সূর্য।। এভাবে না এলে হয়তো আর কোনওভাবেই আসতো না।

দীপা।। না এলে আসতো না—জীবনের একমাত্র পরিণতি কি শুধুমাত্র বিয়েতেই!

সূর্য।। একমাত্র পরিণতি না হলেও, অন্যতম পরিণতি তো বটেই। আর এভাবে না করলে তোমায় হয়তো পেতামই না।

দীপা।। তোমার বড় ভয় ছিল আমাকে হারানোর—তাই না!

সূর্য।। ছিল। তবে এখন আর নেই। আর কেন থাকবে না বলো তো! সেই ব্যাঙ্ক অফিসারের সঙ্গে তোমার বাবা তো প্রায় পাকা কথা বলেই ফেলেছিলেন।

দীপা।। না বলে কী করবে? বেকার বাউন্ডুলেকে জামাই করার জন্য কোন মা-বাবা সারা জীবন বসে থাকে—

সূর্য।। আমি কিন্তু পুরো বেকার নই। টিউশুনি করে হাজারখানেক তো রোজগার করি। তারপর ধর কোনও নেশা করি না। নিজের পয়সায় সিনেমা-থিয়েটার দেখি না—লেখালেখি করে মাঝেমধ্যে—

দীপা।। সবই বুঝলাম। কিন্তু এক হাজার টাকায় তো আর সংসার চলে না এ বাজারে। তারপর নম নম করে এ বিয়ে সারতেও তো হাজার দশেক টানা দেনা হল।

সূর্য।। হল তো হল। শোধ করে দেব।

দীপা।। কীভাবে! লটারিতে টাকা পেয়ে!

সূর্য।। লটারি—হ্যাঁ লটারিই বলতে পার। ফিল্ম প্রোডিউসারদের দরজায় দরজায় তো ঘুরছি—একটা উপন্যাস পছন্দ হয়ে গেলেই—

দীপা।। সত্যি! কত ট্রাশ গল্প উপন্যাস নিয়ে ছবি হচ্ছে, সিরিয়াল হচ্ছে—আর তোমার কোনও লেখা—

সূর্য।। কী পরিচিতি আছে আমার বল—কোনও বড় হাউসে লেখার সুযোগ পেলাম না—প্রগতিবাদী পত্রিকায় লিখে প্রগতিশীল হওয়া যায়, কিন্তু তাতে পেট ভরে না। এই সত্যটা বুঝতে বুঝতেই জীবনের অনেকগুলো বছর চলে গেল।

দীপা।। আমি কিন্তু ভীষণ আশাবাদী। তোমাকে নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন। আমি স্বপ্ন দেখি, এমন একদিন আসবে যখন তোমার গল্প-কাহিনী ছাড়া কেউ ফিল্ম করার ঝুঁকি নিতে সাহসই পাবে না। তোমার নাম থাকা মানেই বক্সঅফিসে ছবি সুপার ডুপার হিট—আমাদের অনেক টাকা হবে তখন—গাড়ি হবে—বাড়ি হবে—তোমার অনেক নাম হবে—

[*ড্রিমি মিউজিক ভেসে আসে। দৃশ্যান্তর।*]

দীপা।। ফিরতে এত দেরি হল আজ!

সূর্য।। টিউশনির টাকা পাবার জন্য বসে ছিলাম।

দীপা।। পেলে?

সূর্য।। না। সোনাদের বাড়িতে দু'ঘণ্টা বসেছিলাম ওর বাবার জন্য।

দীপা।। দেখা হল না—

সূর্য।। না, বাড়িতে ফোন করে রাত নটার সময় জানালেন, ফিরতে রাত হবে।

দীপা।। আশ্চর্য! মাস পয়লা হয়ে গেছে। টাকাটা বাড়িতে রেখে গেলেই তো পারে।

সূর্য।। পারে। কিন্তু তাহলে তো আর কোনও শিক্ষককে দু'ঘণ্টা বাড়িতে বসিয়ে রাখা যায় না। নিজেকে মাঝে মাঝে ভিখারির চেয়েও ছোট মনে হয় দীপা।

দীপা।। টাকাটার আজ বড় প্রয়োজন ছিল। দু'মাসের ওপর বাড়ি ভাড়া বাকি পড়েছে। বোসদা সকালে একবার এসেছিলেন।

সূর্য।। শুধু বাড়ি ভাড়া কেন, ইলেকট্রিক বিল জমা দেবার লাস্ট ডেটও তো কালকে—কী যে করি।

দীপা।। এখন আর কিছু করার নেই। চা-টা জুড়িয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নাও—

সূর্য।। (চা-য়ে চুমুক দেবার শব্দ) শেষ পর্যন্ত কি তাহলে তোমার কথাই সত্যি হবে দীপা—

দীপা।। কী কথা।

সূর্য।। এভাবে আমাদের বিয়েটা না হলেই বোধহয় ভাল হত।

দীপা।। এমন কথা বলেছিলাম বুঝি!

সূর্য।। তোমার মনে নেই। তার উত্তরে আমি বলেছিলাম, দু'বছরের মধ্যেই তোমার এ ধারণা আমি ভুল প্রমাণ করে দেব।

দীপা।। মনে আছে বাবা সব মনে আছে। তবে দু'বছর শেষ হতে এখনও কিন্তু সপ্তাহ দুয়েক বাকি আছে।

সূর্য।। এর মধ্যে অঘটন কিছু ঘটবে বলে তোমার মনে হয়?

দীপা।। ঘটতেও তো পারে। এই দেখো একটা রেজিস্ট্রি করা খাম এসেছে তোমার নামে।

সূর্য।। আমার নামে! আগে বলবে তো—

দীপা।। এই নাও। (খামের মুখ ছেঁড়ার শব্দ। একটু নীরবতা) কী হল, কোনও সুখবর!

সূর্য।। সুখবর! আমার জন্য! একটা গল্প পাঠিয়েছিলাম এক প্রোডিউসার কোম্পানিকে, পেপারে বিজ্ঞাপন দেখে। ওরা রিগ্রেট উইথ থ্যাঙ্কস পাঠিয়েছে।

দীপা।। কোন গল্পটা?

সূর্য।। ‘শুধু তোমারই জন্য’। দারুণ ফিল্মিক এলিমেন্ট ছিল। ‘সিনেরিও’র একটা আউট লাইনও পাঠিয়েছিলাম—

দীপা।। বোধহয় পড়েও দেখেনি।

সূর্য।। পড়ে না দেখুক—ভদ্রতা করে ফেরত তো পাঠিয়েছে।

দীপা।। দশ টাকার পোস্টাল স্ট্যাম্প মেরে—

সূর্য।। লাইটারটা কোথায়?

দীপা।। ড্রয়ারে আছে। এত রাতে আবার সিগারেট ধরাবে নাকি—একি স্ক্রিপ্টে আগুন লাগাচ্ছ কেন—কী হচ্ছে!

সূর্য।। পুড়িয়ে দেব। সব পুড়িয়ে দেব। সূর্যশেখর দত্তর নামটা লেখার জগত থেকে চিরকালের জন্য মুছে দেব।

দীপা।। তুমি কি পাগল হলে। শিগগির আগুন নেভাও। সর, সরে যাও, আগুন বাড়ছে। আ, কী হচ্ছে সর, আগুন নেভাতে দাও।

সূর্য।। (কান্নায় ভেঙে পড়ে) আমি হেরে গেলাম দীপা, আমি হেরে গেলাম। না পেলাম কোনও চাকরি, লেখক হিসেবে কোনও প্রতিষ্ঠা,—শুধু শুধু তোমাকে নতুন জীবনের সুখ আর সচ্ছলতার স্বপ্ন দেখিয়েছিলাম—আমি তোমাকে ঠকিয়েছি দীপা—আমি তোমায় ঠকিয়েছি—

[*সূর্যশেখরের কান্নার ওপর প্যাথোজ মিউজিক ওভার ল্যাপ করে। দৃশ্যান্তর।*]

দীপা।। কী হল, আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলে।

সূর্য।। শরীরটা ভাল লাগল না—জ্বর জ্বর লাগছে—

দীপা।। কই, না কপাল তো ঠাণ্ডাই আছে। আসলে এগুলো হচ্ছে দুর্বলতা থেকে আর টেনশন থেকে। সারাদিন কোথায় থাক—কী খাও—তোমার একটা মেডিকেল চেক-আপ দরকার।

সূর্য।। দরকার তো অনেক কিছুই। কিন্তু টাকা কোথায়? নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। মাস গেলে চারশো টাকা ঘর ভাড়া, লাইটের বিল—তোমার নিজের চেহারার দিকে একবার তাকিয়েছ—একটা কাজের লোক রাখতে পারলে তুমি অন্তত একটু বিশ্রাম পেতে—

দীপা।। আমার কথা না ভেবে নিজের শরীরের কথা ভাব। আমি তো ভালই আছি। ও শোন, একটা কথা তোমায় কদিন ধরে বলব বলব ভাবছি—তুমি যদি

রাগ কর—

সূর্য।। কেন! রাগ করব কেন! তোমার কথা তুমি আমায় বলবে না তো—বলবে কাকে—

দীপা।। মানে ভাবছিলাম সংসারে তো টাকার দরকার—একটা বোর্ড অ্যাকটিংয়ের অফার পেয়েছি—

সূর্য।। তার মানে—তুমি প্রফেশনাল স্টেজে অভিনয় করবে!

দীপা।। হ্যাঁ, অনেক ভদ্রশিক্ষিত পরিবারের মেয়েরাই করছে—তা ছাড়া বিয়ের আগে কয়েক বছর আমি তো 'অবেক্ষণ' গ্রুপে অভিনয় করেছি—

সূর্য।। করেছ, তবে সেটা বিয়ের আগে। বিয়ের পর আমি সুস্থ-সক্ষম থাকতে তুমি মুখে রং মেখে স্টেজে নামবে অ্যাকটিং করতে! কক্ষনও না—

দীপা।। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে ইগোতে লেগে গেল। জানতাম তুমি রাজি হবে না, অ্যাফটার অল পুরুষ মানুষ তো—

সূর্য।। না, ব্যাপারটা তা নয়—

দীপা।। তা নয়তো কী—বাপের বাড়ি থেকে কোনও সাহায্য নিতে দেবে না, ক্রেশ খুলতে চেয়েছিলাম—দেবে না—অভিনয় করতে দেবে না—বিয়ের আগে তো নিজেকে বুদ্ধিজীবী বলে পরিচয় দিতে, নারী স্বাধীনতার সপক্ষে গলাবাজি করতে—

সূর্য।। হ্যাঁ করতাম, তাতে হয়েছেটা কী! সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পাল্টায়, আমিও পাল্টেছি—

দীপা।। পাল্টেছ তো বটেই—এতটাই পাল্টেছ যে মানুষ থেকে অমানুষ হতে চলেছ—

সূর্য।। দীপা! কথাবার্তা একটু সংযত হয়ে বল।

দীপা।। কেন সংযত হব! নিজের বৌ ঘরে ছেঁড়া শাড়ি পরে থাকে, একবেলা খেয়ে আরেকবেলা উপোস দেয়—এগুলো চোখে দেখতে পাও না। বাড়িওলা এসে যখন কথা শুনিয়ে যায়, পাওনাদারেরা তাগাদা দেয়, মাসের ১৫ তারিখ যেতে না যেতেই যখন অন্যের কাছে হাত পাততে হয়, তখন তোমার এসব ইগো কোথায় থাকে? কোথায় থাকে মান সম্মান বোধ? বউ রং মেখে স্টেজে নামলেই তোমার জাত যাবে তাই না—

সূর্য।। একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি এমন সিন ক্রিয়েট করছ না—

দীপা।। সিন ক্রিয়েট নয়। তোমাকে আমি সোজাসুজি বলে রাখছি, এভাবে সংসার চালাতে আমি আর পারছি না। দেহে আর মনে ক্ষতবিক্ষত হতে হতে আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি। আমি মুক্তি চাই।

সূর্য।। দীপা।

[*দৃশ্যান্তর বোঝাতে আবহসঙ্গীতের প্রয়োগ হবে।*]

সূর্য।। দীপা—দীপা—কোথায় গেলে—দীপা।

দীপা।। কী হল, ভর সন্ধেবেলা চেঁচাচ্ছ কেন—

সূর্য।। দীপা আমি লটারি পেয়েছি দীপা, আমি লটারি পেয়েছি।

দীপা।। লটারি! দেখি মুখটা কাছে আনো তো—শুঁকে দেখি নেশা করেছ নাকি—

সূর্য।। নেশা নয় দীপা—সত্যি—হ্যাঁ দীপা আমি সত্যিই পেয়েছি—এই দেখ দশ হাজার টাকার চেক।

দীপা।। চেক। হ্যাঁ এটা তো চেকই। কারা কিনলো তোমার গল্প? কি কন্ট্রাক্ট হল?

সূর্য।। বি. এম. প্রোডাকসন্স। ওরা বাংলা ওড়িয়া দ্বিভাষিক ছবি বানাচ্ছে, সিরিয়াল আছে, হিন্দি প্রোজেক্ট আছে। এই দশ হাজার টাকা জাস্ট অ্যাডভান্স। দিন তিনেকের মধ্যে সিনেরিও কমপ্লিট করে নিয়ে গেলে আর দশ হাজার—তারপর আরও—আরও—(উত্তেজনায় হাঁফাতে থাকে)

দীপা।। আমাদের অভাব তাহলে কেটে যাবে বলছ—

সূর্য।। যাবে মানে! গেছে। আমার সঙ্গে একেবারে লিখিত কন্ট্রাক্ট ছ'মাসের জন্য। এই ছ'মাস আমি অন্য কোনও প্রোডাকসন্সকে গল্প দিতে পারব না। (খুস খুস করে কাশতে থাকে।)

দীপা।। শেষ পর্যন্ত ওপরওয়ালা মুখ তুলে চাইলেন। এই শোন, দু'চারদিনের মধ্যেই তো চেকটা ভাঙিয়ে টাকা পয়সা পাওয়া যাবে—টাকাটা পেলেই আমার প্রথম কাজ হবে তোমাকে একজন বড় ডাক্তারকে দেখানো। আমি কালকেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ফেলব।

সূর্য।। খেপেছ—আগে ধারদেনাগুলো কিছুটা শোধ করি। তারপর ধর, আমাদের জামাকাপড় অন্তত দুসেট করে কিনতে হবে, একজন কাজের লোক রাখতে হবে। রোজ হাত পুড়িয়ে রান্না করছ—একটা গ্যাসের খোঁজখবরও করতে হবে। আরেকটা ভাল বাড়ি—

দীপা।। সব হবে। তোমার কোনও ইচ্ছেতেই আমি বাধা দেব না। তবে সবার আগে তোমার মেডিকেল চেক আপ আমি করাবই। ইট ইজ মাস্ট মাস্ট

অ্যান্ড মাস্ট।

সূর্য।। বেশ বাবা, বেশ বেশ বেশ। তুমি যা চাইবে সেটাই প্রথমে হবে। তবে আমারও কিন্তু একটা জিনিস তোমার কাছে চাইবার আছে দীপা—

দীপা।। কী!

সূর্য।। আই ওয়ান্ট টু বি ফাদার—

দীপা।। রিয়েলি!

সূর্য।। হ্যাঁ। যদি সত্যিই আমাদের সব অভাব মিটে যায়—

দীপা।। আমারও ভীষণ মা হতে ইচ্ছে করে। টলমল পায়ে হেঁটে এসে কচি কচি দুটো হাত আমাকে জড়িয়ে ধরবে।

সূর্য।। শুধু তোমাকে, আমাকে নয়!

দীপা।। এখন থেকেই হিংসে হচ্ছে বুঝি?

সূর্য।। হবে না—সন্তান হলেই তো মেয়েরা স্বামীকে বেমালুম ভুলে যায়—

দীপা।। আর যেই যাক—আমি যাব না। তুমি আমি আর নবাগত সেই অতিথিকে নিয়েই ভরে উঠবে আমাদের সংসার। আমাদের সেই ছোট্ট সোনা বড় হয়ে হয়তো তোমার মতোই গল্প লিখবে, কবিতা লিখবে। লেখক হবে। বেশ নামী দামি লেখক। গর্বে আমাদের বুক ভরে যাবে—

[*ড্রিমি মিউজিক। দৃশ্যান্তর হবে।*]

দীপা।। ফিরতে এত দেরি করলে কেন? অসুস্থ শরীর নিয়ে বেরিয়েছ। বার বার বলে দিলাম তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। ছটার সময় ডাঃ চক্রবর্তীর চেম্বারে যাব ব্লাড রিপোর্টটা আনতে—তা নয়, সাতটা বাজিয়ে ফিরলে—

সূর্য।। রিপোর্টটা আমি নিয়েই এসেছি দীপা।

দীপা।। নিয়ে এসেছ! ভাল করেছ। ডাঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করে এলেই পারতে।

সূর্য।। দেখাও করেছি। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়েছে।

দীপা।। কী বললেন উনি?

সূর্য।। বললেন, আমার একটা ব্লাড ডিসঅর্ডার হয়েছে—রক্তের অসুখ আর কি!

দীপা।। রক্তের অসুখ! অ্যানিমিয়া।

সূর্য।। না। আসলে অসুখটা উনি প্রথমে আমাকে বলতে চাননি। কিন্তু যেসব প্রশ্ন উনি আমাকে করলেন, তা থেকেই আমি বুঝে গেলাম, কোন অসুখে আমি ভুগছি।

দীপা।। (আতঙ্কে) কোন অসুখ! লিউকিমিয়া!

সূর্য।। না, লিউকিমিয়ারও আজকাল চিকিৎসার সুযোগ আছে, অনেকে ভালও হচ্ছে।

দীপা।। তবে কোন অসুখ।

সূর্য।। যে অসুখের একমাত্র পরিণতি মৃত্যু—আমি সেই কালব্যাধিতে ভুগছি দীপা—রোগটার নাম এড্‌স।

দীপা।। সে কি! (জার্ক মিউজিক। দীপার আর্ত চিৎকার) এসব তুমি কী বলছ!

সূর্য।। আমি ঠিকই বলছি দীপা। আমার রক্তে এইচ আই ভাইরাস পাওয়া গেছে। আই অ্যাম সাফারিং ফ্রম এড্‌স।

দীপা।। তুমি জান, তুমি যা বলছ, সে কথার অর্থ কী! তুমি কি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছ!

সূর্য।। না দীপা। বিশ্বাস না হলে এই খামে রিপোর্টটা আছে—তুমি খুলে দেখতে পার।

দীপা।। না, আমি বিশ্বাস করি না। কিছুতেই বিশ্বাস করি না। তোমার এ রোগ হতে পারে না। কিছুতেই না—কিছুতেই না—(কান্নায় ভেঙে পড়ে। প্যাথোজ মিউজিক শুরু হয়)

সূর্য।। ডাঃ চক্রবর্তীও বিশ্বাস করতে চান নি। আশ্চর্য হয়েছেন। আমি কিন্তু অবিশ্বাস করিনি দীপা—আশ্চর্যও হইনি।

দীপা।। তার মানে! তুমি কি আগে থেকেই জানতে যে তোমার এই রোগ হবে?

সূর্য।। না আগে থেকে সেভাবে জানতাম না। তবে যখন জানলাম যে বারে বারে—

দীপা।। বারে বারে! বারে বারে কী?

সূর্য।। এসব প্রসঙ্গ এখন থাক দীপা—আমি ভীষণ ক্লান্ত। একটু বিশ্রাম নিতে দাও।

দীপা।। বিশ্রাম। নিজের অনন্ত বিশ্রাম নেবার ব্যবস্থা তো নিজেই করেছ। কিন্তু তুমি আমার জীবন নিয়ে একি ছিনিমিনি খেলা খেললে! বাড়ির অমতে বিয়ে করে মা-বাবা-ভাই-বোন সবার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে দিলাম। গান-আবৃত্তি-নাটক-পড়াশোনা সব ছেড়ে এই চার দেওয়ালের ঘেরাটোপে নিজেকে বন্দি করে রাখলাম। অভাব-অনটনে বিয়ের এই তিন বছরে মা হতে চাইনি—কিন্তু তার বিনিময়ে তুমি আমাকে কী দিলে। প্রতারণা করলে, তঞ্চকতা করলে—তুমি, তুমি আমাকে শেষ পর্যন্ত ঠকালে—আমার

ভালবাসাকে অপমান করলে—

সূর্য।। না-না দীপা। বিশ্বাস কর আমি তোমায় ঠকাইনি, তোমার ভালবাসাকে অপমান করিনি—

দীপা।। করনি—নিজে মুখে এই মিথ্যে কথাটা বলতে তোমার লজ্জা করছে না—ঘরে বউ থাকতে বারে বারে তুমি কোথায় যেতে—কোন ব্রথেলে—

সূর্য।। ব্রথেল! এসব তুমি কী বলছ দীপা!

দীপা।। কেন, তুমি জানো না, কোন নরকে বারে বারে গেলে এই নোংরা রোগ হয়—ছিঃ ছিঃ, শেষ পর্যন্ত তুমি রেড লাইট এরিয়া থেকে—

সূর্য।। কি সব যা তা বলছ। বিশ্বাস কর আমি কোনও নোংরা সংসর্গে—

দীপা।। চুপ কর। এখন বুঝতে পারছি, এতগুলো টিউশনি করেও কেন তুমি সংসারে ও কটা টাকা দিতে। কেন রিস্ট ওয়াচ হারানোর মিথ্যে গল্প আমার কাছে ফেঁদেছিলে। ওই টাকায় তুমি ও-পাড়ায় যেতে ফুর্তি করতে।

সূর্য।। দীপা, প্লিজ স্টপ। দয়া করে আমার কথাটা তুমি শোন।

দীপা।। কোনও কথা নয়। তোমার মতো লম্পটের মুখ দেখাও পাপ। আমি এক্ষুনি এ সংসার ছেড়ে চলে যাব।

সূর্য।। যাবে নিশ্চয়ই যাবে। তবে তার আগে আমার সমস্ত কথা তোমাকে শুনতে হবেই। ইউ হ্যাভ টু লিসেন—

দীপা।। আমাকে স্পর্শ করো না। তোমার মতো পাপীর সংস্পর্শে থাকার চেয়ে মৃত্যুও ভাল। পথ ছাড়। আমায় যেতে দাও—

সূর্য।। যাওয়ার আগে জেনে যাও বারে বারে আমি কোথায় যেতাম—কোন নরকের দ্বারে—

দীপা।। নিজে মুখে সেটা বলতে তোমার লজ্জা করবে না।

সূর্য।। না দীপা—লজ্জা থাকলে শরীরের রক্ত বিক্রি করে কেউ সংসার চালায়—

দীপা।। রক্ত বিক্রি! কে করতো। তুমি!

সূর্য।। হ্যাঁ দীপা। আমি করতাম, নিজের দেহের রক্ত প্রতি মাসে বিক্রি করতাম এই অভাবের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে। একটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাংক থেকে এজন্য প্রতি মাসে তিনটে কড়কড়ে একশো টাকার নোট পেতাম। ভেবেছিলাম—এই অভাবের কালো মেঘ কেটে গেলে এ কাজ আমি ছেড়ে দেব। কিন্তু—

দীপা।। এ তুমি কী করলে! এভাবে তিলে তিলে নিজেকে খুন করলে? আমাকে

কেন জানালে না একথা—

সূর্য।। কী হত জানালে? তুমি তোমার শেষ সম্বল হাতের দুগাছা চুড়ি আর গলার হারটা বিক্রি করে দিতে—তাতে কি সংসারের খিদে মিটতো—

দীপা।। তুমি একজন শিক্ষিত মানুষ হয়ে একাজ করলে কী করে! তুমি জানতে না এভাবে রক্ত দিলে কী হয়, রক্ত নেবার সুচ দিয়ে কীভাবে নানা রোগ শরীরে ঢোকে। টিভি, রেডিও, পেপারে এত প্রচার শুনেও শেষ পর্যন্ত তুমি—(কান্নায় ভেঙে পড়ে)

সূর্য।। স্যরি দীপা। আমি জানতাম সবই—কিন্তু এড্‌সের মতো কালান্তক রোগের ভাইরাস যে আমার শরীরেই ঢুকবে তা আমি কখনওই ভাবিনি—তুমি আমায় নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলে দীপা—আমি তোমায় দেখিয়েছিলাম—অভাবের থাবায় ক্ষতবিক্ষত হতে হতে আমি শুধু নিজেকেই শেষ করলাম না, তোমার স্বপ্নকেও শেষ করে দিলাম। আমায় ক্ষমা করো (গলা বুজে আসে)।

দীপা।। মিথ্যা সন্দেহে আমি তোমায় যা নয় তাই বলেছি (কাঁদতে থাকে)—অথচ তুমি নিজের শরীরের রক্ত দিয়ে আমায় বাঁচাতে চেয়েছিলে, ভাল রাখতে চেয়েছিলে—কেন—কেন এমন হল। একটু সুখের আলো দেখতে না দেখতেই এ কোন অন্ধকারে তলিয়ে গেলাম আমরা—বল সূর্য—বল—কী আমাদের অপরাধ—একি সূর্য কথা বলছ না কেন—তোমার শরীর এমন ঠাণ্ডা লাগছে কেন! সূর্য তোমার চোখ দুটো অমন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে কেন—

সূর্য।। (অনেক কষ্টে গোঙাতে গোঙাতে) দীপা দীপা—আমি বিষ—

দীপা।। (চিৎকার করে কেঁদে ওঠে) সূর্য—কী করলে তুমি—এ কী করলে—তোমাকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টাও আমায় করতে দিলে না—আমাকে সেবা করার কোনও সুযোগ না দিয়ে সূর্য—এ কী করলে তুমি—রিপোর্টটা তো ভুলও হতে পারে। সূর্য—একবার তাকাও আমার দিকে—সূর্য কেন এমন করলে তুমি—(কান্নায় ভেঙে পড়ে। নাটক শেষের আবহসঙ্গীত ভেসে আসে।)

নিঃশব্দ বিষ
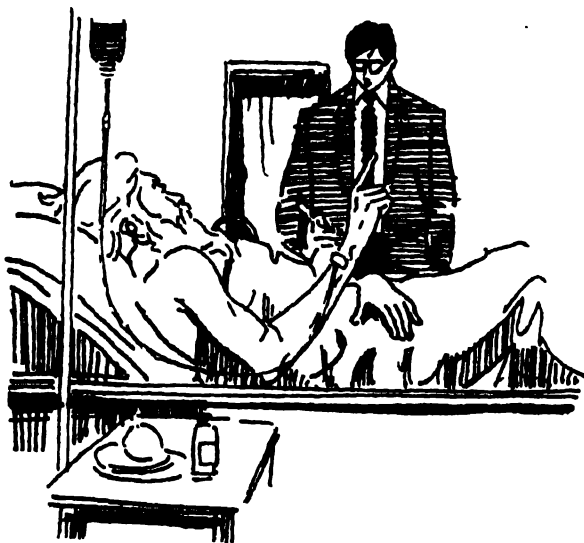
চরিত্র ❑ ডাঃ গুপ্ত ।। অজিতবাবু ।। সিস্টার

[*বইমেলা। আবহসঙ্গীতের মাঝে কোলাহল এবং ঘোষণা, 'বই পড়ুন বই পড়ান। বই কিনে কেউ ফতুর হয় না। কলকাতা পুস্তকমেলা রজতজয়ন্তী বর্ষে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে।' ঘোষণা ধীরে ধীরে কমে আসে।*]

ডাঃ গুপ্ত।। আরে অত হুড়োহুড়ি করছিস কেন? আস্তে হাঁট, পড়ে যাবি। মায়ের হাতটা ভাল করে ধর না—পড়লি তো। অপদার্থ কোথাকার!

সিস্টার।। অপদার্থ বলছেন কেন? এত ভিড়ে আমরা বড়রাই হাঁটতে পারছি না, আর ও তো ছোট।

ডাঃ গুপ্ত।। দেখুন তো ওর ধাক্কায় আপনার বই-এর প্যাকেট ছিটকে পড়লো।

সিস্টার।। ছিটকে পড়ে ভালই হয়েছে। তা না হলে আপনার সাথে এভাবে দেখাই হতো না (একটু নীরবতা)—কি চিনতে পারছেন নাতো!

ডাঃ গুপ্ত।। খুব চেনা চেনা লাগছে। কিন্তু—

সিস্টার।। কিন্তু চিনতে পারছেন না। দেখুন আপনার কর্তার অবস্থাটা। মাত্র এগারো বছরেই আমাকে ভুলে গেছেন। ক্যানসার হাসপাতালের কথাও কি ভুলে গেছেন নাকি।

ডাঃ গুপ্ত।। আরে অনিতাদি না?

সিস্টার।। যাক, মনে পড়েছে তাহলে।

ডাঃ গুপ্ত।। আমি চিনতেই পারিনি এতক্ষণ। আর কী করেই বা চিনবো! যা মোটা হয়ে গেছেন এই ক'বছরে। মীরা, ইনি হচ্ছেন আমার অনিতাদি। ক্যানসার হাসপাতালে বছর পাঁচেক একসঙ্গে কাজ করেছি। আর অনিতাদি ইনি হচ্ছেন—

সিস্টার।। আপনার স্ত্রী। আর এই ফুটফুটে ছটফটেটা আপনার মেয়ে। ঠিক বলেছি তো—(সবাই হেসে ওঠে)

ডাঃ গুপ্ত।। মীরা, তুমি মমকে নিয়ে অডিটরিয়ামে গিয়ে বসো। আমি অনিতাদির সঙ্গে একটু কথা বলেই আসছি। ইচ্ছে করলে আপনিও আসতে পারেন আমাদের সঙ্গে।

সিস্টার।। আরে না, না—ঘণ্টা চারেক ধরে এই ধুলো আর ভিড়ে ঘুরছি, আর পারছি না, তাছাড়া আজ নাইট ডিউটি আছে।

ডাঃ গুপ্ত।। বেশ তোমরা তাহলে এগোও।

সিস্টার।। হোয়াট এ সারপ্রাইজ! কতদিন বাদে দেখলাম আপনাকে। এখন আছেন কোথায়? যাবার আগে তো কারও সাথে দেখা করে আসেননি।

ডাঃ গুপ্ত।। সেরকম মানসিক অবস্থা আমাদের কারোরই ছিল না। আপনি তো জানেন, দীর্ঘ পাঁচবছর সারভিস দেবার পর কীভাবে আমাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সিস্টার।। আপনারা তো ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখাও করেছিলেন।

ডাঃ গুপ্ত।। হ্যাঁ। অন্তত বার চারেক। আমি, ডাঃ কর আর ডাঃ মিত্রকে একসঙ্গে ই টারমিনেট করা হয়েছিল। আমার বাবা তখন সেরিব্রাল থ্রমবোসিস

হয়ে নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলেন। ভেবেছিলাম হাসপাতাল থেকে কিছু টাকা লোন নেব বাবার চিকিৎসার জন্য—সে সুযোগ আর পেলাম না। বাবাও আর কোনও চিকিৎসার সুযোগ না দিয়ে দিন সাতেকের মধ্যেই মারা গেলেন।

সিস্টার।। ভীষণ খারাপ কেটেছে সেই দিনগুলো না—আমাদেরও খুব খারাপ লাগতো আপনাদের তিনজনের কথা ভেবে।

ডাঃ গুপ্ত।। ওই হাসপাতাল ছেড়ে আসবার সময়ই তিনজন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ক্যানসার নিয়েই কাজ করব আমরা। তাই করছি। বারাসাত ক্যানসার হাসপাতালের নাম শুনেছেন তো? ওটা আমরাই, কয়েকজন সমাজসেবী তরুণ-তরুণীকে নিয়ে গড়ে তুলেছি।

সিস্টার।। ওটা আপনাদের হাসপাতাল! কনগ্র্যাচুলেশন! শেষ পর্যন্ত পেরেছেন তাহলে আপনারা। জানেন, আপনারা চলে আসার বছর তিনেকের মধ্যেই ওই হাসপাতালটাও শেষ হয়ে গেল। ওয়ার্ক কালচার বলে আর কিছু রইল না, কেউ ঠিকমতো কাজ করতো না, কাউকে মানতো না, সুযোগ পেলেই একে অন্যের পেছনে লাগতো। শেষ পর্যন্ত আমিও ছেড়ে দিলাম।

ডাঃ গুপ্ত।। এখন কোথায় আছেন?

সিস্টার।। উড্ল্যান্ডসে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে।

ডাঃ গুপ্ত।। ফাইন। বিয়েটা আর করলেন না অনিতাদি।

সিস্টার।। হয়ে উঠল না যে। আসলে আপনারা তিন-তিনজন ইয়ং ডাক্তার এই দিদিটাকে ছেড়ে চলে গেলেন, পাত্র খোঁজার তো কেউই রইল না। (দু'জনে হেসে ওঠে)

এবার তাহলে আসি। উড্ল্যান্ডসে ফোন করে চলে এলেই হবে। ওখানেই স্টাফ কোয়ার্টারে থাকি আমি। যান, ওরা অডিটরিয়ামে অপেক্ষা করছে।

ডাঃ গুপ্ত।। আচ্ছা অনিতাদি, আমরা চলে আসার পর, ডাক্তার-সিস্টার-স্টাফ সবাই মিলে আর নাটক হয়েছে, কিংবা পিকনিক, স্পোর্টস?

সিস্টার।। না, আমি থাকাকালীন আর হয়নি। ডাঃ গুপ্ত আপনার একটা ধন্যবাদ পাওনা আছে আমার কাছে।

ডাঃ গুপ্ত।। ধন্যবাদ! কিসের! কী এমন কাজ করেছিলাম আপনার জন্য যে

ধন্যবাদ দিতে হবে আমায়?

সিস্টার।। আমার জন্য নয়, একজন পেশেন্টের জন্য।

ডাঃ গুপ্ত।। পেশেন্ট! হু ইজ দ্যাট ফেলো?

সিস্টার।। অজিতবাবুর কথা আপনার মনে আছে? অজিত সামন্ত।

ডাঃ গুপ্ত।। অজিত সামন্ত!

সিস্টার।। হ্যাঁ ক্যানসার হাসপাতালের বি-ওয়ার্ডের চোদ্দ নম্বর বেডের পেশেন্ট ছিল।

ডাঃ গুপ্ত।। অজিতবাবু! অজিত সামন্ত—বি-ওয়ার্ড, চোদ্দ নম্বর বেড-

[*সাসপেন্স মিউজিক। ফ্ল্যাশ ব্যাক শুরু হয়। টেলিফোন বেজে ওঠে*]

ডাঃ গুপ্ত।। হ্যালো, ডাঃ গুপ্ত বলছি।

সিস্টার।। হ্যাঁ, আমি সিস্টার অনিতা বলছি।

ডাঃ গুপ্ত।। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন-বলুন।

সিস্টার।। এইমাত্র ওয়ার্ডে একটি এমারজেন্সি পেশেন্ট এসেছে। খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। মাস তিনেক আগে মেডিক্যাল কলেজে দেখিয়েছিল। ল্যারিংসে ক্যানসার।

ডাঃ গুপ্ত।। ওখানে চিকিৎসা করায়নি?

সিস্টার।। না, বায়োপসি করতে হবে শুনে ভয়ে আর ওখানে যায়নি।

ডাঃ গুপ্ত।। এখন বারোটা বাজিয়ে এখানে এসে হাজির হয়েছে। সঙ্গে বাড়ির লোক আছে?

সিস্টার।। হ্যাঁ, দু-একজন মহিলা এসেছেন। তবে ওনার স্ত্রী নন কেউ।

ডাঃ গুপ্ত।। কনসেন্ট পেপারে সই করিয়ে নিন। অপারেশন থিয়েটার রেডি করুন। আমি মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আসছি।

সিস্টার।। থ্যাঙ্ক ইউ।

[*দৃশ্যান্তের বোঝাতে আবহসঙ্গীতের প্রয়োগ হবে*]

সিস্টার।। বেঁচে গেলেন শেষ পর্যন্ত।

ডাঃ গুপ্ত।। না বাঁচলেই বোধহয় ভাল হত।

সিস্টার।। একথা কেন বলছেন!

ডাঃ গুপ্ত।। এটাকে কি বাঁচা বলে। পুরো ল্যারিংসেই ছড়িয়ে পড়েছে ক্যানসার, গলার দুপাশে গ্ল্যান্ডে পর্যন্ত। গলায় ফুটো করে রোগীকে বাঁচাতে হল।

সিস্টার।। অথচ যখন মাস তিনেক আগে প্রথম রোগটা ধরা পড়েছিল তখন

চিকিৎসা শুরু করলে—

ডাঃ গুপ্ত।। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যেতেন এতদিনে।

সিস্টার।। আসলে রোগটা নিয়ে আমাদের এত ভয় আর কুসংস্কার—

ডাঃ গুপ্ত।। এটা দূর করার দায়িত্ব তো আমাদের। ডাক্তারদের, স্বাস্থ্যকর্মীদের—হয়তো যে ডাক্তারবাবুরা পেশেন্টকে আগে দেখেছিলেন, তাঁরা তাকে ঠিকমতো কনভিন্স করতে পারেননি। যাই হোক, অ্যাট প্রেজেন্ট পেশেন্ট ইজ আউট অব ডেঞ্জার। আপনি বায়োপসির স্যাম্পেলটা এখুনি ল্যাবে পাঠিয়ে দিন। এই ওষুধগুলো পেশেন্ট পার্টিকে এনে দিতে বলুন। এই বোতলটা শেষ হয়ে গেলে স্যালাইন খুলে দেবেন। ইভিনিং রাউন্ডে আবার দেখা হবে। চলি।

[*দৃশ্যান্তর বোঝাতে আবহসঙ্গীতের প্রয়োগ হবে। অজিতবাবুর ভূমিকাভিনেতা ফ্যাসফেসে গলায় কথা বলবেন, সঙ্গে অল্প কাশির দমক—যেভাবে শ্বাসযন্ত্রের ক্যানসারের রোগীরা কথা বলেন আর কি—*]

ডাঃ গুপ্ত।। কেমন আছেন অজিতবাবু?

অজিত।। আ-আ-আ।

ডাঃ গুপ্ত।। আগে বুড়ো আঙুল দিয়ে টিউবের মুখটা বন্ধ করুন—হ্যাঁ, এইভাবে। এবার কথা বলার চেষ্টা করুন, ধীরে ধীরে, কেটে কেটে—হ্যাঁ বলুন, বলুন।

অজিত।। ভা-ল আ-ছি, ত-বে খুব ব্যথা।

ডাঃ গুপ্ত।। ব্যথা তো হবেই। শ্বাসনালীর সামনের দিকে একটা ফুটো করে তবে এই ট্র্যাকিওসটোমি টিউবটা ঢোকাতে পেরেছি, নইলে তো আপনি শ্বাস আটকে মরেই যেতেন।

অজিত।। ধ-ন্য-বা-দ, অসংখ্য ধন্যবাদ।

ডাঃ গুপ্ত।। কিসের ধন্যবাদ? আমি তো শুধু আমার কর্তব্যটুকুই করেছি। আজ আর কোনও কথা নয়। কালকেই দেখবেন আপনার ব্যথা কমে গেছে, তখন অনেক গল্প হবে আপনার সঙ্গে। সিস্টার আর কোনও নতুন পেশেন্ট অ্যাডমিশন হয়েছে?

সিস্টার।। না, আর কোনও নতুন পেশেন্ট নেই।

ডাঃ গুপ্ত।। অজিতবাবুর বাড়ির লোক এসেছিল? ওষুধপত্র এনে দিয়েছে?

সিস্টার।। না, সেই যে কাল দু'জন ভদ্রমহিলা এসেছিলেন। প্রেসক্রিপশন নিয়ে

চলে গেলেন—আজ আর তো কেউই এলেন না।

ডাঃ গুপ্ত।। ভদ্রলোকের ছেলে-টেলে কেউ নেই? থাকেন কোথায়?

সিস্টার।। ছেলেরা নাকি বিদেশে থাকে। আর ভদ্রলোক ভাড়া থাকেন ওই ভদ্রমহিলাদের বাড়িতে। ওনারাই নাকি ওনার দেখভাল করেন।

ডাঃ গুপ্ত।। যার ছেলেরা বিদেশে থাকে, তাকে এখানে ভাড়াবাড়িতে থাকতে হয়! স্ট্রেঞ্জ। ঠিক আছে, আপাতত আমাদের স্টক থেকেই ওষুধপত্র দিন। কাল আমি পেশেন্টের সঙ্গে কথা বলব।

[*দৃশ্যান্তর বোঝাতে আবহসঙ্গীতের প্রয়োগ হবে*]

ডাঃ গুপ্ত।। কেমন আছেন অজিতবাবু? আজ বেশ ফ্রেস লাগছে।

অজিত।। (ফ্যাসফেসে গলায়) ভাল আছি ডাক্তারবাবু। কাশিটাও আজ কম আছে। ভাল হয়ে যাব তো—

ডাঃ গুপ্ত।। ভাল হতে চান আপনি?

অজিত।। নিশ্চয়ই চাই ডাক্তারবাবু।

ডাঃ গুপ্ত।। তাহলে এতদিন দেরি করলেন কেন? তিনমাস আগেই তো মেডিক্যাল কলেজে আপনাকে বায়োপসি করতে বলেছিল। না করে পালিয়ে বেড়ালেন কেন, কেন হাতুড়েকে দিয়ে এতদিন চিকিৎসা করিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনলেন।

অজিত।। সবই আমার কপাল ডাক্তারবাবু। অদৃষ্টের ফের। আপনার হাতে যদি মিনিট পাঁচেক সময় থাকে, তাহলে দুটো কথা বলি।

ডাঃ গুপ্ত।। সময় আমার হাতে আছে, কিন্তু বেশি কথা বললে আপনার যদি কষ্ট হয়।

অজিত।। বলতে পারলে একটু হাল্কা হব, না বললেই বরং কষ্ট হবে।

ডাঃ গুপ্ত।। বেশ বলুন।

অজিত।। দেশভাগের সময় বাবার হাত ধরে আমি আর আমার এক দিদি ওপার থেকে এপার বাংলায় চলে আসি। মা ছোটবেলাতেই মারা গিয়েছিলেন। তখন আমার বয়স বছর কুড়ি হবে। এক আত্মীয়র বাড়িতে আশ্রয় পাই আমরা। বাবাও একটা ভাল চাকরি জুটিয়ে ফেলেন পোর্ট কমিশনার্সে। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই হার্ট-অ্যাটাকে বাবা মারা যান। আমার মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়ে। শুরু হয়ে যায় বাঁচার লড়াই। সারাদিন টিউশনি করে রাতে কলেজে পড়তাম। থাকতাম এক

হোস্টেলে। এভাবেই গ্র্যাজুয়েট হবার পর একটা চাকরি পেয়ে যাই এক ওষুধ কোম্পানিতে। কয়েক বছর টাকা জমিয়ে দিদির বিয়ে দেই। এরপর আমার প্রমোশন হয় সিনিয়ার ফার্মাসিস্ট পোস্টে। বছর দুয়েক বাদে নিজেও বিয়ে করি। বছর দেড়েক বাদে এক পুত্রসন্তানের বাবা হই আমি। সংসারে তখন আমার খুশির জোয়ার। লোন নিয়ে একটা জমি কিনে ফেলি, বাড়ি তৈরিও শুরু করি। সব যখন ঠিকঠাক চলছিল ঠিক তখনই দ্বিতীয়বার মা হতে গিয়ে মীরা, আমার স্ত্রী মারা যায়, সন্তানটি অবশ্য বেঁচে যায়।

ডাঃ গুপ্ত।। সো স্যাড। তারপর?

অজিত।। সুখের বেলুনটা হঠাৎ করে চুপসে যায় আমার জীবনে। দুই শিশুপুত্র নিয়ে অকুল পাথারে পড়ি আমি। সাম্যব্রত আর শুভব্রত। মা মরা এই দুই সন্তানকে বুক দিয়ে আগলে রেখে বড় করার কঠিন লড়াই শুরু হয় আমার।

ডাঃ গুপ্ত।। দ্বিতীয়বার বিয়ে করেননি?

অজিত।। না। পাছে নতুন মায়ের কাছে ওরা অবহেলিত হয়। এমনকি দিদি বা অন্য কোনও আত্মীয়স্বজনের কাছেও পাঠাইনি ওদের। হস্টেলেও দেইনি। সে বড় কষ্টের দিন গেছে আমার। সারাদিন ওদের দেখভাল করতে গিয়ে প্রায়ই অফিস কামাই করতে হত। প্রাইভেট ফার্ম, টাকা কেটে নিত। সন্ধেতে একটা ওষুধের দোকানে পার্ট-টাইম কাজ নিলাম। বাড়িটাও অনেক কষ্টে শেষ করলাম। শেষ পর্যন্ত ছেলেদুটোকে স্কুলের গণ্ডি পার করালাম। দুটোই পড়াশোনায় বেশ ভাল ছিল। বড়টা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ চান্স পেল শিবপুরে। পাস করে একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে ভাল অফার পেল, ওরাই ওকে বছর দুয়েকের মধ্যে বিদেশে পাঠিয়ে দিল হায়ার স্টাডিজ করতে। শেষ পর্যন্ত ওখানেই ও সেট্‌ল করল।

ডাঃ গুপ্ত।। কোথায়?

অজিত।। আমেরিকার নিউ জার্সিতে।

ডাঃ গুপ্ত।। আর ছোটজন?

অজিত।। ও কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। দাদার মতো ওরও ইচ্ছে হল বিদেশে যাবে। অনেক চেষ্টা করেও কোনও স্পনশরশিপ পেল না। শেষ পর্যন্ত

আমার বাড়িটা বন্ধক রেখে সেই টাকায় ওকে টরেন্টোতে পাঠালাম।

ডাঃ গুপ্ত। ও কি ফিরে এল?

অজিত।। না, ওখানকার মেয়েকে বিয়ে করে ওখানেই সফট্‌ওয়্যারের ব্যবসা শুরু করল, ব্যবসা কয়েক বছরের মধ্যে জমে যেতে ওখানেই থেকে গেল।

ডাঃ গুপ্ত।। তাহলে আপনি থাকেন কোথায়?

অজিত।। ঠাকুরনগরে, এক ভাড়া বাড়িতে।

ডাঃ গুপ্ত।। ছেলেরা খোঁজখবর নেয়, দেখাশোনা করে?

অজিত।। প্রথম প্রথম নিত। এখন আর সময় পায় না, তাছাড়া আমার তো ফোন নেই।

ডাঃ গুপ্ত।। নিয়মিত টাকা পাঠায়?

অজিত।। বড়ছেলে পাঠায়। ওই টাকা থেকেই একটু একটু করে জমিয়ে বাড়িটা মহাজনের কাছ থেকে প্রায় ছাড়িয়ে এনেছি। আগামী সপ্তাহেই দলিলপত্র ফেরত দিয়ে দেবে শেষ কিস্তির টাকা পেলে। এর মধ্যে তো এই বিপত্তি ঘটে গেল।

ডাঃ গুপ্ত। ছেলেদের জানাননি অসুস্থতার কথা?

অজিত।। হ্যাঁ জানিয়েছি। সাম্য ও শুভ দুজনেই বলল, চিন্তা না করতে। ওরা এসে আমাকে ওখানে নিয়ে যাবে চিকিৎসার জন্য। ওখানে তো এ রোগের একেবারে লেটেস্ট চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে।

ডাঃ গুপ্ত।। কবে কথা হয়েছে ছেলেদের সঙ্গে?

অজিত।। তা মাস দেড়েক তো হয়ে গেছে।

ডাঃ গুপ্ত।। এর মধ্যে ওরা আর যোগাযোগ করেনি?

অজিত।। না, বোধহয় প্লেনের টিকিট পাচ্ছে না, কিংবা ছুটি ম্যানেজ করতে পারছে না।

ডাঃ গুপ্ত।। আপনি জানেন, কি রোগ হয়েছে আপনার?

অজিত।। কেন জানব না, ক্যানসার হয়েছে আমার।

ডাঃ গুপ্ত।। এ রোগ দ্রুত বাড়ে, তা জানতেন?

অজিত।। হ্যাঁ, টিভিতে একটা প্রোগ্রাম দেখে তাও জেনেছিলাম।

ডাঃ গুপ্ত।। তবে বায়োপসি করতে দেরি করলেন কেন?

অজিত।। ওই যে সাম্য আর শুভ বলল, আমাকে ওদের ওখানে নিয়ে গিয়ে

চিকিৎসা করাবে। আর তাছাড়া আমারও তো হাত খালি, ওরা কেউ তো গত মাসে টাকাও পাঠায়নি।

ডাঃ গুপ্ত।। আপনি কি এখনও বিশ্বাস করেন, ওরা আপনাকে নিতে আসবে?

অজিত।। আসবে, নিশ্চয়ই আসবে। মা মরা ছেলেরা আমার। চোখের সামনে দেখেছে কত কষ্টে বুক দিয়ে আগলে ওদের মানুষ করেছি আমি, এত বড় অকৃতজ্ঞ ওরা হতে পারে না। ওদের শরীরে তো আমারই রক্ত বইছে।

ডাঃ গুপ্ত।। ওরা অকৃতজ্ঞ না হলে আমিও খুশি হব। এখন আসি। অনেক কথা বলেছেন আজ, এখন অ্যাবসোল্যুটলি ভয়েজ রেস্ট। চলি।

[*দৃশ্যান্তর বোঝাতে আবহসঙ্গীতের প্রয়োগ হবে।*]

সিস্টার।। অজিতবাবু, আপনার জন্য দারুণ খবর আছে।

অজিত।। খবর! কী খবর?

সিস্টার।। আপনার বড় ছেলে এইমাত্র ফোন করেছিলেন।

অজিত।। সামু, আমার সাম্যব্রত ফোন করেছিল! কোথা থেকে?

সিস্টার।। গ্র্যান্ড হোটেল থেকে। আজ মর্নিং ফ্লাইটে এখানে এসেছেন। আপনাকে দেখতে বিকেলে এখানে আসছেন।

অজিত।। শুধু দেখতে নয়, নিয়ে যেতে আসছে সিস্টার।

সিস্টার।। তার মানে! আমরা আপনার জন্য এত কিছু করলাম—কাল থেকে আপনার রেডিয়েশন শুরু হবে—আর আপনি বলছেন চলে যাবেন।

অজিত।। যেতে যে আমাকে হবেই।

সিস্টার।। কেন?

অজিত।। ওখানে যে আমার দাদুভাই আছে। সামুর ছেলে। বছর তিনেক বয়স। জন্মের পর থেকে তো দেখিনি। এই প্রথম দেখব।

সিস্টার।। যাকে দেখেননি তার জন্য এত টান!

অজিত।। রক্তের সম্পর্ক যে। বছর চারেক বয়সেই সামু ওর মাকে হারিয়েছিল। তখন থেকে ওর বিদেশ যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমিই ছিলাম ওর একমাত্র ভরসা, আশ্রয়স্থল। ছোটবেলায় ওরা দু'ভাই আমাকে ঘোড়া বানিয়ে আমার পিঠে চেপে বসতো, বলতো হ্যাট হ্যাট হ্যাট। সেই সামুর ছেলে এবার আমাকে ঘোড়া বানিয়ে আমার পিঠে চেপে বসবে। সিস্টার এত দুঃখ-কষ্ট সয়েও এজন্যই তো আমাদের বেঁচে থাকা।

ডাঃ গুপ্তকে এখুনি খবর পাঠান, আমার ডিসচার্জ সার্টিফিকেট উনি যেন লিখে রাখেন। পাগল ছেলে আমার, হয়তো এখান থেকেই আমাকে নিয়ে এয়ারপোর্টে ছুটবে। বাবা অন্তপ্রাণ তো। আর হবে নাই বা কেন, আমারই তো সন্তান। কম করেছি ওদের জন্য!

সিস্টার।। চলে গেলে আমাদের জন্য মন খারাপ লাগবে না?

অজিত।। হ্যাঁ, তা একটু লাগবে বই কি। আপনারাই তো আমাকে বাঁচিয়ে তুললেন। শ্বাস আটকে তো প্রায় মরেই যাচ্ছিলাম। আপনাদের জন্যই নাতিটার মুখ দেখতে পাব। কতদিন পর দেখা হবে বড় বৌমার সঙ্গে। আমার ছোট ছেলে শুভ আর ছোট বৌমা, ওরাও নিশ্চয়ই আমাদের রিসিভ করতে এয়ারপোর্টে আসবে। ওদের সঙ্গে দেখা না হলে আমি তো মরেও সুখ পেতাম না। ডাঃ গুপ্তকে খবরটা এখুনি দিলে ভাল হত না—

সিস্টার।। অপারেশনে ব্যস্ত আছেন। শেষ হলেই খবরটা দিচ্ছি। আপনি ডাইনিং হলে খেতে চলুন। অন্য সব পেশেন্ট কিন্তু চলে গেছে।

অজিত।। আপনি যান, আমি যাচ্ছি।

[*দৃশ্যান্তর বোঝাতে আবহসঙ্গীতের প্রয়োগ হবে।*]

ডাঃ গুপ্ত।। কি অজিতবাবু, আমাদের ছেড়ে চললেন। কবে নিয়ে যাচ্ছে ছেলে? আগামী কাল? না না, মন খারাপ করার কিছু নেই। আমি সব শুনেছি। ওখানে তো আপনার আপনজন সবাই আছেন। তাছাড়া চিকিৎসার সুযোগ পাবেন, প্রিয়জনদের সেবাও পাবেন।

[*কান্নায় ভেঙে পড়েন অজিতবাবু। সান্ত্বনা দেন ডাঃ গুপ্ত।*]

ডাঃ গুপ্ত।। আরে কাঁদার কী আছে। আমি ডিসচার্জ সার্টিফিকেট লিখে দিচ্ছি।

অজিত।। (কান্না ভেজা গলায়) এইটে একবার দেখেন।

ডাঃ গুপ্ত।। কি দেখব! এটা তো কোর্ট পেপার। এটা আপনাকে কে দিলো?

অজিত।। আমার বড় ছেলে সামু এসেছিল কোর্টের লোক নিয়ে। আমার বুকের পাঁজর দিয়ে গড়া বাড়িটা ওকে লিখে দিতে হবে। ও নাকি ওটা ভেঙে ফেলে প্রমোটারকে দিয়ে ওখানে ফ্ল্যাট তুলবে।

ডাঃ গুপ্ত।। সে কী!

অজিত।। হ্যাঁ ডাক্তারবাবু। এই কাগজে আমায় সই করে দিতে হবে, এই যে এই জায়গায়। না করলে আমার চিকিৎসা বন্ধ করে দেবার হুমকি

দিয়েছে।

ডাঃ গুপ্ত।। এ আপনি কী বলছেন! ওরা আপনাকে আমেরিকা নিয়ে যাবে না চিকিৎসার জন্য?

অজিত।। আমেরিকা! এখানে নিজের পয়সায় চিকিৎসা করাচ্ছি, তাও বলেছে বন্ধ করে দেবে। আর আমেরিকা—(কেঁদে ফেলে) ডাক্তারবাবু আমি হেরে গেলাম। এতদিন ধরে যে স্বপ্নটা আমি বুকের মধ্যে পুষে রেখেছিলাম, আজ যে সেটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এর চেয়ে ওর সঙ্গে দেখা না হওয়া তো অনেক ভাল ছিল। ডাক্তারবাবু, ওই দুটো মা মরা ছেলেকে আমি যে অনেক কষ্ট করে মানুষ করেছি। জীবনের সব সাধ-স্বপ্ন তো ওদের জন্যই বিসর্জন দিয়েছি—আর ওরা কিনা আমাকে—(হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকেন)

ডাঃ গুপ্ত।। কী করবেন। মনে করুন এটাই আপনার রিউয়ার্ড। আর বাড়িটা তো আপনি অনেক দিন ধরেই ভোগ করতে পারছেন না। আপনার সুসন্তানরাই করুক না হয়—

অজিত।। না কক্ষনো না, আমি বেঁচে থাকতে নয়। মীরা নিজে পছন্দ করে জমিটা কিনেছিল, আর্কিটেক্ট দিয়ে প্ল্যান করিয়েছিল, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ির কাজ তদারকি করতো—বাড়ি যখন প্রায় শেষ তখন ও আমায় ছেড়ে চলে গেল। ডাক্তারবাবু, ওই বাড়ির ইট-কাঠ-সিমেন্টে আমি যে মীরার স্পর্শ পাই—এতগুলো বছর ওর স্মৃতি নিয়েই যে আমি ওই বাড়িতে কাটিয়েছি। আমার ধার প্রায় শোধ হয়ে গেছে। সামনের মাসেই তো আমি আবার ওখানে ফিরে যেতাম। ওই অকৃতজ্ঞ-বেইমান দুটো জানে না এ বাড়ি মীরার কতটা ছিল। ডাক্তারবাবু, একটা অনুরোধ করব, রাখবেন। আমার তো দিন শেষ হয়ে এল। আমার মৃত্যুর পর আমার ছেলেরা বাড়িটা তো প্রমোটারের হাতে তুলে দেবে। আচ্ছা, বাড়িটা যদি আমি কোনও মিশনকে দান করে যাই—দেখুন না ডাক্তারবাবু একটু খোঁজ-খবর করে। এটা না হলে আমি যে মরেও শান্তি পাব না। দেখবেন তো—কথা দিন ডাক্তারবাবু, কথা দিন।

ডাঃ গুপ্ত।। কথা দিলাম। দেখব, নিশ্চয়ই দেখব। আপনি এখন ঘুমিয়ে পড়ুন।

অজিত।। ঘুম আসে না ডাক্তারবাবু—এখানটায় যে বড় জ্বালা। এই জ্বালা নিয়ে ঘুমোনো যায়!

ডাঃ গুপ্ত।। চেষ্টা করুন, নিশ্চয়ই ঘুম আসবে। গুড নাইট।

[*আবহসঙ্গীতে দৃশ্যান্তর হয়। টেলিফোন বেজে ওঠে।*]

ডাঃ গুপ্ত।। হ্যালো—

সিস্টার।। আমি অনিতাদি বলছি।

ডাঃ গুপ্ত।। কী হল, কোনও পেশেন্ট খারাপ হয়ে গেছে?

সিস্টার।। না না, সব ঠিকই আছে। তবে অজিতবাবুর সেই সুসন্তান আজ আবার এসেছে, সঙ্গে জনা পাঁচেক লোক। জোর করে একটা দলিলে সই করানোর চেষ্টা করছে। তর্কাতর্কি চলছে।

ডাঃ গুপ্ত।। আশ্চর্য! আপনি ওয়ার্ডে এগুলো অ্যালাও করছেন।

সিস্টার।। না, মেট্রনকে খবর পাঠিয়েছি। আপনাকেও জানালাম।

ডাঃ গুপ্ত।। এগুলো না করে দারোয়ানকে দিয়ে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ওদের বার করে দিন ওয়ার্ড থেকে। এক্ষুনি।

সিস্টার।। পরে যদি ওরা ডিরেক্টরকে রিপোর্ট করে।

ডাঃ গুপ্ত।। স্ট্রেঞ্জ! পরেরটা পরে ভাবা যাবে। আমি অ্যাক্টিং আর.এম.ও.। আমি অর্ডার দিচ্ছি আপনি ক্যারি আউট করুন। আমি ওয়ার্ডে আসছি।

[দৃশ্যান্তর বোঝাতে আবহসঙ্গীতের প্রয়োগ হবে।]

ডাঃ গুপ্ত।। কী হল অজিতবাবু, মন খারাপ করে বসে আছেন কেন। ডাইনিং রুমে গিয়ে টিভি দেখুন সবার সঙ্গে।

অজিত।। আর টিভি! আমার জীবন থেকে সব আলো-হাসি-গান যে হারিয়ে গেল ডাক্তারবাবু। আর আমার বেঁচে থেকে লাভ কী! কাদের জন্য বাঁচব। মানুষ তো বাঁচে মানুষের জন্য। কিন্তু ওরা যে অমানুষ, পশু—

ডাঃ গুপ্ত।। শান্ত হন অজিতবাবু। ওদের ওপর রাগ করে নিজের বাকি জীবনটা নষ্ট করবেন কেন। আপনি আজ তো 'রে' নিতেও যাননি।

অজিত।। আর গিয়ে কি লাভ। আমার রোগটা যে কোন স্টেজে তা তো আমি জানি। 'রে' দিয়েও কিছু হবে না। কয়েকদিন হয়তো বেশি বাঁচব। কিন্তু কেন বাঁচাবো, কাদের জন্য আর বাঁচব বলতে পারেন? যে হাত দিয়ে আমি ওকে মানুষ করেছি, আমার ছেলে সামু আজ আমায় বলে গেল, দলিলে সই না করলে সেই হাত নাকি ভেঙে দেবে। মীরা, তুমি কেন, বলো তুমি কেন, ওই অমানুষগুলোর জন্ম দিয়েছিলে? ওরা যে তোমার সাধের বাড়ি থেকে আমাকেই বার করে দিতে

চাইছে—মীরা তুমি কি শুনতে পাচ্ছ। মীরা।

[*হঠাৎ কাশির দমক শুরু হয়। অজিতবাবুর শ্বাস আটকে আসে।*]

ডাঃ গুপ্ত।। কী হল অজিতবাবু! আপনার কষ্ট হচ্ছে? (অজিতবাবু কেশেই চলে) সিস্টার সিস্টার শিগ্‌গির সাকার মেশিন নিয়ে আসুন, এমার্জেন্সি ড্রাগের ট্রলি কোথায়—হারি আপ, ডাক্তার করকে কলবুক পাঠান। ফ্লুয়িড রেডি করুন। পেশেন্ট কিন্তু কোলাপস করছে।

[*ডাক্তার সিস্টারদের চিৎকার-চেঁচামিচির মধ্যে দ্রুতলয়ের আবহসঙ্গীতে দৃশ্যান্তর হয়। ফ্ল্যাশব্যাক শেষ। বইমেলার টুকরো টুকরো ঘোষণা ভেসে আসে।*]

ডাঃ গুপ্ত।। স্যাড। ভেরি স্যাড। কতদিন আগের কথা। তবু মনে পড়লে মনটা এখনও কেমন খারাপ হয়ে যায়। আপনার খারাপ লাগে না অনিতাদি?

সিস্টার।। লাগে। আবার আনন্দ হয় এই ভেবে যে একজন মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের শেষ দুটো ইচ্ছেকেই আপনি সম্মান দিয়েছিলেন।

ডাঃ গুপ্ত।। আমি!

সিস্টার।। হ্যাঁ আপনি। আর কেউ না জানলেও আমি কিন্তু সবই জানি ডাক্তার গুপ্ত।

ডাঃ গুপ্ত।। কী জানেন?

সিস্টার।। অজিতবাবুর ইচ্ছে ছিল তার বসতবাড়ি এবং সঞ্চিত সামান্য অর্থ কোনও মিশনকে দান করে যাবেন। আপনি উদ্যোগী হয়ে দু-একদিনের মধ্যে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এমনকি সাক্ষী হিসেবে দানপত্রে সইও করেছিলেন।

ডাঃ গুপ্ত।। হ্যাঁ করেছিলাম। এক অসহায় মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের শেষ ইচ্ছেকে সম্মান জানানো কি অন্যায়?

সিস্টার।। আমি তো বলিনি অন্যায়। এমনকি এরপরও আপনি যা করেছিলেন আমার চোখে সেটাও অন্যায় ছিল না।

ডাঃ গুপ্ত।। এরপরে মানে—কী করেছিলাম আমি! আমার তো ঠিক মনে পড়ছে না।

সিস্টার।। গোপন করে আর লাভ কী ডাক্তার গুপ্ত। অজিতবাবু নেই, আমি কিংবা আপনিও দীর্ঘদিন ওই হাসপাতালে নেই। লেট আস কনফেস।

[*স্মৃতিচারণ শুরু করে সিস্টার, সঙ্গে আবহসঙ্গীত।*]

ডাঃ গুপ্ত।। অজিতবাবু যে রাতে মারা যান, সেই রাতটা ছিল ভীষণ দুর্যোগপূর্ণ।

রাত তখন প্রায় দুটো। আমার নাইট ডিউটি ছিল, সঙ্গে ছিল জুনিয়ার সিস্টার হেনা। ওকে ঘুমোতে পাঠিয়েছিলাম রেস্টরুমে। আমি ছিলাম ওয়ার্ডে। বসে বসে ঢুলছিলাম। হঠাৎ বাজ পড়ার বিকট শব্দে জেগে উঠলাম। একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ কানে এল। সেদিন বিকেল থেকেই অজিতবাবুর অবস্থা খারাপ ছিল, তাই ওনার বেডের কাছেই আগে ছুটে গেলাম। শব্দটা অজিতবাবুর গলা-বুক বেয়ে উঠে আসছিল। তাড়াতাড়ি গলার টিউবটা সাকশন করে দিলাম। পাল্স কাউন্ট করে দেখি, ইরিগুলার, রেট তিরিশেরও কম। আর দেরি না করে ফোনে ডেকে পাঠালাম আপনাকে।

ডাঃ গুপ্ত।। ছুটে এলাম আমি। দেখলাম পাল্স খুব ফিব্ল, প্রেসারও কাউন্টেবল নয়। অজিতবাবু গ্যাস্প করছেন। আপনি এমার্জেন্সি ট্রলি ঠেলে নিয়ে এলেন। ফ্লুয়িড চলছিল, রেটটা বাড়িয়ে দিলাম। একটা ডেকাড্রন ইনজেকশন সিরিঞ্জে ভরে এগিয়ে দিলেন আপনি। ইনজেকশনটা ইনট্রাভেনাস দিতে যাব, হঠাৎ লাইট অফ হয়ে গেল, আপনি এমার্জেন্সি লাইটটা জ্বালিয়ে দিয়ে একটা টর্চ নিয়ে ছুটলেন জেনারেটর অপারেটরকে ঘুম থেকে তুলতে। হঠাৎ বাজ পড়ল, সঙ্গে তীব্র আলোর ঝলকানি। অজিতবাবুর যন্ত্রণাক্লিষ্ট নিথর মুখটা মুহূর্তের জন্য আলোকিত হয়ে উঠল। ওই মুখের দিকে তাকিয়ে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল আমার। মনে পড়ল, বৃদ্ধের সেই করুণ আর্তি—আমি আর বাঁচতে চাই না বাবা, মানুষ তো বাঁচে মানুষের জন্য—আমি কাদের জন্য বাঁচব? হঠাৎ এমার্জেন্সি ড্রাগের ট্রলিতে চোখ পড়ল আমার। চারটে পেথিডিনের অ্যাম্পুল রয়েছে সেখানে, আমার বিচারবুদ্ধি সব হঠাৎ লোপ পেতে শুরু করল, একটা দানব কিংবা দেবতা যেন তখন ভর করল আমার ওপর। অজিতবাবু তো এই নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতেই চেয়েছিলেন। তবে আর এই মৃতপ্রায় মানুষটিকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী! পেথিডিনের অ্যাম্পুলগুলোই তো সেই কাঙ্ক্ষিত মুক্তি এনে দিতে পারে। কিন্তু আমি তো একজন ডাক্তার, পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল আমার—কাজটা কি ঠিক করছি আমি? বাইরে ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঝড় উঠল আমার মনেও, উথাল-পাথাল ঝড়।

সিস্টার।। আমি তখন জেনারেটর অপারেটরকে খবর দিয়ে ফিরে এসেছি।

ওয়ার্ডের পর্দা উড়ছে হাওয়ায়। এমার্জেন্সি লাইটের ম্লান আলোয় আপনাকে কেমন যেন ভৌতিক লাগছে, অস্বাভাবিক চোখ-মুখ আপনার। আমি পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলাম। সিরিঞ্জের ডেকাড্রনটা ফেলে দিলেন আপনি, ত্রস্ত হাতে পেথিডিনের অ্যাম্পুলগুলো ভেঙে সিরিঞ্জে একটার পর একটা টেনে নিলেন—তারপর অজিতবাবুর শিরায় পুশ করে দিলেন। এমন সময় জ্বলে উঠল ওয়ার্ডের সব আলো। আপনি তাড়াতাড়ি অ্যাম্পুলগুলো নোংরা ফেলার বালতিতে ছুঁড়ে দিলেন, কিন্তু অ্যাম্পুলগুলোর মাথার দিকটা ট্রলিতেই পড়ে রইল। কোনও মতে টলতে টলতে ওয়ার্ড ছেড়ে কোয়ার্টারের পথ ধরলেন আপনি। শুধু বলে গেলেন—সিস্টার, পেশেন্ট সিম্‌স টু বি এক্সপায়ার্ড।

ডাঃ গুপ্ত।। আমি কী সেদিন অন্যায় করেছিলাম সিস্টার? কাজটা করার পর থেকে আজ পর্যন্ত একটা চাপা যন্ত্রণা বুকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি আমি। ডাক্তারের কাজ তো প্রাণ নেওয়া নয়, প্রাণ দেওয়া। তবে আমি একাজ করতে গেলাম কেন? অজিতবাবু যে আমাকে সন্তানের মতো স্নেহ করতেন (গলা ধরে আসে)।

সিস্টার।। না ডাক্তার গুপ্ত, আপনি কোনও অন্যায় করেননি সেদিন। আগে আপনি একজন মানুষ, তার পর তো ডাক্তার। অজিতবাবু তো মরেই ছিলেন, দেহে এবং মনে। আপনি আর নতুন করে তাকে কী মারবেন? বরং আপনি তাকে এই নরকযন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়েছেন। মন থেকে সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলুন, বাঁচার আনন্দে বাঁচুন ডাক্তার গুপ্ত, মানুষের মতোই বাঁচুন।

[*বইমেলায় ঘোষণা ভেসে আসে। ডাঃ সৌরভ গুপ্ত, আপনি গিল্ড অফিসের সামনে চলে আসুন। আপনার স্ত্রী ও কন্যা এখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। ঘোষণা খুব ধীরে চলতে থাকে।*]

সিস্টার।। যান, প্রিয়জন আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন অনেকক্ষণ। আমিও চলি। আবার দেখা হবে নিশ্চয়ই।

[*নাটক শেষের আবহসঙ্গীত ভেসে আসে।*]

অসুখ

চরিত্র ❑ বৃদ্ধা ।। মম ।। শিবনাথ ।। সুশঙ্কর

বৃদ্ধা।। দেখো দিকি! এতো রাতে আবার গপ্পো পড়ে শোনাতে হবে! তাহলে ঘুমুবি কখন?

মম।। মাত্র তো দু'পাতা। তুমি পড়ে শোনাও। শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

বৃদ্ধা।। এতো বড় হয়েছিস, ইংরেজি স্কুলে পড়িস। এসব তো নিজেই পড়তে পারিস এখন।

মম।। তা পারি। তবে তোমার মতো অত সুন্দর করে তো পড়তে পারব না। জানো দিয়া, তুমি না আমাদের স্কুলের মিসদের থেকেও ফার বেটার রিডিং পড়।

বৃদ্ধা।। কিসব ঘটর মটর বলছিস—আমি ছাই অত কি বুঝি!

মম।। তোমার তো বোঝার দরকার নেই—তুমি শুধু পড়ে যাও। স্টার্ট ফ্রম হিয়ার—

বৃদ্ধা।। দাঁড়া চশমাটা পড়ি। চোখে কি ছাই আগের মতো দেখি। সব কেমন ঝাপসা লাগে।

মম।। দাঁড়াও টিউবলাইটটাও জ্বেলে দি। এবার তুমি ভাল করে দেখতে পাবে। কি পাচ্ছ না—নাও এবার পড়।

বৃদ্ধা।। (বই দেখে পাঠ করার ভঙ্গিতে) দুঃখীর ছেলে হারু। অতটুকু ছেলে। গাই রাখে, কাঠ কুড়ায়, গাইয়ের দুধ দুহিবার সময় বাছুর ধরে, কোঁচড়ে মুড়ি বাঁধিয়া বাপের সঙ্গে মাঠে যায় আর নদীর ধারে—(চোখে ছানি থাকায় ভাল করে পড়তে পারে না) দেখ তো মম—এটা কি লেখা আছে।

মম।। নদীর ধারে ছুটাছুটি করে।

বৃদ্ধা।। কাল চেহারা, আর ভারি চঞ্চল। কাল পাথরে খোদাই ছোট্ট মূর্তিটি যেন, সারা অঙ্গে দুষ্টামি আঁকা! সে কি স্থির থাকে? কোঁচড় খুলিয়া মুড়ি খায়, জলে ছোট ছোট ঢিল ফেলে, তাহাতে টুব টুব করিয়া শব্দ হয় আর হারু হাততালি দিয়া নাচে—(চুপ করে)

মম।। কি হল দিয়া থামলে কেন!

বৃদ্ধা।। আর যে পারি না, চোখে যন্ত্রণা হয়, সবই ঝাপসা লাগে।

মম।। তাহলে দাও, আমি পড়ি বাকিটা।

বৃদ্ধা।। নে পড়। আমি একটু চোখ বুঝে থাকি।

মম।। বুধীর বাছুরটি যে ছিল, সেটি কিছুদিন হয় মারা গিয়াছে। তাহার জন্য ছোট্ট ছেলে হারুর মন কেমন—কেমন করে। বাছুর কেমন নাচিয়া নাচিয়া আসিত, এদিক-ওদিক ছুটিয়া বেড়াইত, তাহার সঙ্গে কত খেলিত, আবার ছুটিয়া যাইত। আহা হারুর সে বেদনা আর কে বুঝিবে!—বেদনা মানে কি দিয়া—সাফারিংস?

বৃদ্ধা।। ইংরেজি জানিনে সোনা, বাংলায় বলে ব্যথা-যন্ত্রণা—

মম।। তোমার চোখে এখন যা হচ্ছে। আচ্ছা দিয়া, প্রায় দিনই তুমি চোখের ব্যথায় কষ্ট পাও, ভাল করে দেখতে পারো না—ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন!

বৃদ্ধা।। দেখিয়েছি রে। ডাক্তার বলেছে, দু'চোখেই ছানি। অপারেশন করতে হবে—

মম।। তাহলে অপারেশন করাচ্ছ না কেন!

বৃদ্ধা।। বললেই বুঝি অপারেশন করা যায়?

মম।। কেন যায় না।

বৃদ্ধা।। এই বয়েসে নিজের ইচ্ছেয় কি আর সব হয়। বয়স কম হল! অশক্ত শরীর, কোমরে বাতের যন্ত্রণা—

মম।। তুমি এই শরীরে ছোটাছুটি করবে কেন? মামারা সব ব্যবস্থা করবে। দু'দুটো মামা আমার।

বৃদ্ধা।। ওদের ঘর-সংসার নেই, কম ব্যস্ত ওরা! তাছাড়া তোর ছোটমামা তো আলাদা থাকে—

মম।। আলাদা থাকলেও রোজই তোমার সাথে দেখা করে যায়।

বৃদ্ধা।। তা যায়। শঙ্কর আমার সোনার টুকরো ছেলে।

মম।। আর বড়মামা বুঝি পেতলের টুকরো।

বৃদ্ধা।। না, না, তা হবে কেন। শিবুও আমায় খুবই ভালবাসে।

মম।। দুজনেই যখন তোমাকে এতই ভালবাসে দিয়া, তাহলে দু'চোখে ছানি নিয়ে কষ্ট পাচ্ছ কেন?

বৃদ্ধা।। ওদের কী দোষ বল—আমিই গরজ করিনি।

মম।। তুমি মিথ্যে কথা বলছ দিয়া। আসলে মামাদেরই এ নিয়ে কোনও গরজ নেই। ঠিক আছে আমি মামাদের সাথে কথা বলব।

বৃদ্ধা।। না, না, তোর আবার এসব ব্যাপারে নাক গলাবার কি দরকার? দুদিনের জন্য মামাবাড়িতে এসেছিস।

মম।। আমি মামা-মামীর কাছে আসিনি দিয়া—এসেছি তোমার কাছে। তোমার হাতে তৈরি পিঠে-পায়েস খেতে আর রাতে তোমার গল্প পড়া শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তে। সেই গল্পই যদি তুমি ঠিক মতো পড়তে

না পারো—আমার কী ভাল লাগে দিয়া।

বৃদ্ধা।। আমারও কি ছাই ভাল লাগে। কতদিন বাদে এবার আমার কাছে এলি। আয়, মাথার চুলে বিলি কেটে দি, ঘুমিয়ে পড়।

মম।। বেঙ্গমা আর বেঙ্গমীর ছড়াটা একবার শোনাও না দিয়া—শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

বৃদ্ধা।। সবটা কি আর মনে আছে। দেখি চেষ্টা করে।

[*ছড়া কাটতে থাকে সুর করে, সঙ্গে আবহসঙ্গীত।*]

বেঙ্গমা বেঙ্গমীরে কয়, শুনে সর্বজন
অন্তরেতে আসল সুখ, বুঝেরে ক'জন?
অর্থ চাই, বিত্ত চাই, চিত্ত যে চঞ্চল
শান্তি কোথায় পাবি তবে, সবই কর্মফল।
আপনজনে ঘৃণা কর, কর অহংকার
পিতামাতা পর হলে জীবনই আঁধার।
বেঙ্গমী বেঙ্গমারে কয়, এত কথা জান
মানুষের দুঃখে তোমার প্রাণ কাঁদে না কেন?

[আবহসঙ্গীতে দৃশ্যান্তর]

মম।। গুড মর্নিং বড়মামা।

শিবনাথ।। আরে মম যে। ভেরি ভেরি গুড মর্নিং। আমি খবর পেয়েছি তোকে কাল তোর ছোটমামা নিয়ে এসেছে।

মম।। রাতে তাহলে দিয়ার ঘরে এলে না কেন? আমাকেও ডেকে পাঠালে পারতে—

শিবনাথ।। ভেবেছিলাম—বুঝলি, কিন্তু ফিরতে এত রাত হয়ে গেল।

মম।। রাত হল কেন?

শিবনাথ।। তোর মামীকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম তো—

মম।। মামী কোথায়?

শিবনাথ।। ওই বাপের বাড়ি গেল, রঘুনাথপুরে।

মম।। এবারও কী মামীর বাবার খুব অসুখ?

শিবনাথ।। তুই জানলি কি করে বলতো!

মম।। গরমের ছুটিতে আমি যখন এখানে এসেছিলাম, মামী তখনও বাপের

বাড়ি গিয়েছিল—বাবার অসুখটা বেড়েছিল কিনা—তাই ভাবলাম এবারও বুঝি—

শিবনাথ।। হ্যাঁ, ওই বাবার অসুখটাই বাড়ছে কমছে। তাই তো খবর পেলেই ছুটে যায়। আর বাবা-মা যতদিন আছে ততদিন তো যেতে হবেই।

মম।। ঠিক বলেছ বড়মামা। বাবা-মা তো কারও চিরকাল থাকে না। যতদিন তাঁরা বাঁচে, আমাদের উচিত তাদের সেবা করা—তাই না বড়মামা?

শিবনাথ।। একেবারে আমার মনের কথাই বলেছিস রে মম।

মম।। এটাই যদি তোমার মনের কথা হবে, তাহলে তুমি দিয়ার সেবা করছ না কেন?

শিবনাথ।। দিয়ার সেবা মানে!

মম।। তুমি নিশ্চয়ই জানো, দিয়ার দু'চোখে ছানি পড়েছে—

শিবনাথ।। হ্যাঁ আমিই তো ডাক্তার দেখিয়ে সব ব্যবস্থা করলাম।

মম।। কী ব্যবস্থা করলে?

শিবনাথ।। ওষুধ—ডাক্তার কত কি! কত খরচ হল জানিস—

মম।। খরচ তো মা দিয়েছে।

শিবনাথ।। তুই জানলি কী করে!

মম।। বারে—ভুলে গেলে—মাস তিনেক আগে যখন এলাম, মা তো আমার হাত দিয়েই তোমায় পাঁচশো টাকা পাঠালো।

শিবনাথ।। ও হ্যাঁ, দেখ ভুলেই গিয়েছিলাম। তবে পাঁচশো টাকায় কি-ই বা হয়।

মম।। দিয়ার চোখ দুটো অপারেশন করাচ্ছ কবে?

শিবনাথ।। কিসের অপারেশন?

মম।। ছানি অপারেশন।

শিবনাথ।। সে দায়িত্ব তোর ছোটমামা নিয়েছে। আর আমি একা কতদিক সামলাবো বলতো। মাতো আমার একার নয়।

মম।। জানি বড়মামা। আর সেজন্যই বলছি, দিয়ার অপারেশনটা এবার করিয়ে দাও। জানো, দিয়া আর আগের মতো আমায় গল্প পড়ে শোনাতে পারে না। চোখে যন্ত্রণা হয়, জল পড়ে। আমার যে বড় কষ্ট হয় বড়মামা।

শিবনাথ।। না, না, এসব নিয়ে তুই একদম ভাবিস না। আমি শঙ্করের সঙ্গে কথা বলে সব ফাইন্যাল করে নেব। মামীর সঙ্গে ফোনে একবার কথা

বলবি নাকি! তোকে কিন্তু খুব ভালবাসে।

মম।। না থাক। বাবাকে নিয়ে মামী ব্যস্ত আছে, এ সময় ডিস্টার্ব না করাই ভাল। আমি চলি।

[*দৃশ্যান্তর বোঝাতে আবহসঙ্গীতের প্রয়োগ হবে।*]

মম।। দিয়া, দিয়া ছোটমামা এসেছে।

সুশঙ্কর।। এই নে তোর শার্ট, মামী পাল্টে এনেছে। খুলে দেখ এটাও আবার ছোট হয় কিনা!

মম।। না এটার সাইজ ঠিক আছে। তুমি মাকে ফোন করে বলে দিও।

বৃদ্ধা।। কিরে, কখন এলি?

সুশঙ্কর।। এই তো। মমের শার্টটা দিয়ে গেলাম।

বৃদ্ধা।। গায়ে লাগবে তো?

সুশঙ্কর।। এবার লেগে যাবে। তবে দিন দিন যা মোটা হচ্ছে—পরের বার ওর মামী ওকে ম্যাক্সি দেবে বলেছে—

বৃদ্ধা।। মামীকেও বোলো নিজের জন্যও একসেট কিনতে—

সুশঙ্কর।। তা ঠিকই বলেছিস। মামী ভাগ্নী, তোরা পাল্লা দিয়ে ফুলছিস।

বৃদ্ধা।। তুই খেয়ে যাবি তো।

শুশঙ্কর।। না, মা। আজ বাড়ি গিয়েই খাবো। এখানে এলে তো রাতে খেয়েই যাই—তিসা রাগ করে, বলে মা শুধু তোমাকেই ভালমন্দ খাওয়ায়—আমার আর বুবকার কথা মনেই পড়ে না।

বৃদ্ধা।। বলে বুঝি! আরও বলবে না। এক শিশি তিলের নাড়ু রেখেছি—নিয়ে যাবি।

সুশঙ্কর।। তিলের নাড়ু। আজ রাতে তিসা একাই শেষ করে দেবে।

বৃদ্ধা।। বেশ তো। আরও করে রাখব, পরশু দিন আবার নিয়ে যাস। তুই বোস। আমি নিয়ে আসি।

মম।। দিয়ার হাতের ভালমন্দ খাবার আর বেশিদিন খেতে হচ্ছে না ছোটমামা।

সুশঙ্কর।। কেন! মার হাতের রান্না এবার থেকে বুঝি শুধু তুই-ই খাবি।

মম।। কেউই খাবে না। দিয়ার তো দু'চোখে ছানি পড়ে চোখ দুটো নষ্ট হতে বসেছে। রাঁধবে কীভাবে?

সুশঙ্কর।। হ্যাঁ মা বলছিল একদিন। তবে দাদা দায়িত্ব নেওয়াতে আমি আর

ইন্টারফেয়ার করিনি। বৌদি রাগ করতে পারে—

মম।। বড়মামা যে বলল অপারেশন করানোর দায়িত্ব তুমি নিয়েছ।

সুশঙ্কর।। দাদা বলেছে!

মম।। হ্যাঁ আজ সকালেই।

সুশঙ্কর।। আচ্ছা বেশ, আমি দাদার সঙ্গে কাল কথা বলে নেব।

মম।। শুধু কথা নয় ছোটমামা—অপারেশনের ডেটটাও ফাইনাল করে ফেল।

সুশঙ্কর।। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবই করব। তুই এসব নিয়ে এত চিন্তা করছিস কেন? যা, মা-র কাছ থেকে নাড়ুর শিশিটা চট করে নিয়ে আয়। আরও দেরি হলে ফেরার বাস পাব না।

[*দৃশ্যান্তর বোঝাতে আবহসঙ্গীতের প্রয়োগ হবে।*]

শিবনাথ।। তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে, মা।

বৃদ্ধা।। বল, কী কথা!

শিবনাথ।। আচ্ছা মা তোমার কী বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে।

বৃদ্ধা।। ভীমরতি!

শিবনাথ।। ভীমরতি ছাড়া কি। তুমি মমকে বলেছ আমরা নাকি তোমার চোখ অপারেশন করিয়ে দিচ্ছি না। আচ্ছা এসব কথা ও যদি দিদি জামাইবাবুকে বলে—ওরা কী ভাববে বল তো—

বৃদ্ধা।। ভাবলেই বা আপত্তি কোথায়। তোরা তো তোদের সংসার নিয়েই ব্যস্ত। আবর্জনার মতো এক কোণে পড়ে থাকি—আমার চোখ নষ্ট হলে তোদের কী এসে যায়।

শিবনাথ।। মা তুমি মাঝে মাঝে বড় অবুঝের মতো কথা বল—টিভিতে দেখছ—পেপারে পড়ছ—ছানি কাটাতে গিয়ে কতজনের চোখ অন্ধ হয়ে যাচ্ছে—শেষে ছুটতে হচ্ছে শঙ্কর নেত্রালয় বা ভেলোরে। মা তুমি বুঝতে পারছ না—এখন তুমি যেটুকু দেখতে পাচ্ছ তাতে বাকি জীবনটা তোমার হেসে খেলে চলে যাবে। কিন্তু ছানি কাটাতে গিয়ে যদি চোখ দুটো তোমার নষ্ট হয়ে যায়।

বৃদ্ধা।। গেলে যাবে। তবু তুই আমার অপারেশনের ব্যবস্থা কর। আমার টাকায়

আমি অপারেশন করাবো—তোদের আপত্তি কেন?

শিবনাথ।। তোমার টাকা!

বৃদ্ধা।। হ্যাঁ, তোদের বাবার পেনসনের টাকা—

শিবনাথ।। ওই টাকায় অপারেশন হয় বুঝি!

মম।। (দূর থেকে বলে) দি-য়া—ছোটমামা এসেছে—

বৃদ্ধা।। আয় শঙ্কর, বোস—

শিবনাথ।। শঙ্কর, তুই এসে ভালই করেছিস। মার চোখ অপারেশনের ব্যাপারে কথা হচ্ছিল আর কি—

সুশঙ্কর।। আচ্ছা দাদা, তুই আমার নামে মমকে জ্বলজ্যান্ত মিথ্যে কথাটা বলতে গেলি কেন?

শিবনাথ।। মিথ্যে কথা! কিরে মম, কী বলেছি তোকে?

মম।। তুমি যে বললে ছোটমামা দিয়ার অপারেশন করিয়ে দেবে—

শিবনাথ।। ও হ্যাঁ, মানে আর কি—মম তুমি ভেতরে যাও—বড়দের কথার মধ্যে থেকো না—(একটু নীরবতা) দেখ শঙ্কর, মা আমার একার নয়। দায়িত্ব কিন্তু তোরও আছে।

সুশঙ্কর।। জানি। তবে তোর দায়িত্বটাই কিন্তু বেশি।

শিবনাথ।। কেন? আমি বড় বলে?

সুশঙ্কর।। না। যেহেতু মার পেনসনের টাকাটা প্রতিমাসে তুই নিস—

শিবনাথ।। সেটা তো মার পিছনেই খরচ করি।

সুশঙ্কর।। দেড় হাজার টাকা প্রতিমাসে মার পিছনে খরচ হয়! মা তো দুবেলাই নিরামিষ খায়—

শিবনাথ।। মার ওপর যখন তোর অতই দরদ, যা না—কয়েকদিন মাকে তোর ওখানে নিয়ে গিয়েই রাখ না।

সুশঙ্কর।। মা রাজি থাকলে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু তাহলে যে প্রতিমাসে মার পেনসনের টাকাটা তোর হাতছাড়া হয়ে যাবে।

শিবনাথ।। কি যাতা বলছিস। মম বড় হয়েছে। পাশের ঘর থেকে ও যদি এসব কথা শোনে—

বৃদ্ধা।। তোরা এসব আলোচনা এবার বন্ধ কর। আমার ভাল লাগছে না।

শিবনাথ।। না, মা—তোমার অপারেশনের ব্যাপারে শঙ্কর আমায় যাতা বলবে—আর আমি দিনের পর দিন তা শুনে যাব—তা হয় না—শোন শঙ্কর, মার অপারেশনের দায়িত্ব তুই নে—তোর ওখানে নিয়ে গিয়ে সব ব্যবস্থা কর—খরচাখরচ সব আমার—

সুশঙ্কর।। তুই তো খরচ করবি মার টাকা ভেঙেই—বৌদির পারমিশন ছাড়া নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে তো একটা টাকাও তুলতে পারবি না—তাহলে দায়িত্বটা আমি একা নেব কেন?

শিবনাথ।। তুই কিন্তু ভীষণ বে-লাইনে কথা বলছিস। প্লিজ হোল্ড ইওর টাং।

সুশঙ্কর।। কথাটা তোর বউকে বলিস। বৌদি যদি তার টাং-টাকে একটু হোল্ড করতো তাহলে আমাকে আর তিসাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হতো না—

শিবনাথ।। কী-কী বললি। আমার বউ তোদের—

সুশঙ্কর।। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি। তোর আর বৌদির জন্যই মার ছানি অপারেশন এতদিন হয়নি। অপারেশনের কথা উঠলেই তোরা মাকে ভয় দেখিয়েছিস—অপারেশন করলে চোখ নাকি অন্ধ হয়ে যাবে—অথচ তোর শ্বশুরের চোখে মাইক্রোসার্জারি করে তো বিদেশি লেন্স লাগিয়ে নিয়ে এলি—সে বেলায়—

শিবনাথ।। তুই শেষ পর্যন্ত আমার শ্বশুরকেও অপমান করলি—সুযোগ পেলে আমার বউকেও যা তা বলিস—আমি তোকে—আমি তোকে—

সুশঙ্কর।। কী করবি? গায়ে হাত তুলবি। যা আগে বৌদির থেকে পারমিশনটা নিয়ে আয়—

শিবনাথ।। তুই কী ভেবেছিস—যা খুশি তাই বলবি—আর আমি মুখ বুজে সব সহ্য করব—

সুশঙ্কর।। একশোবার করবি। হাজারবার করবি।

শিবনাথ।। না করব না—

সুশঙ্কর।। হ্যাঁ করবি।

[*দুই ভাইয়ে তুমুল ঝগড়া চলতে থাকে। বৃদ্ধা কান্নায় ভেঙে পড়েন।*]

বৃদ্ধা।। ওরে তোরা একি শুরু করলি। আমার অপারেশনের দরকার নেই।

দয়া করে তোরা একটু চুপ কর। মেয়েটা দুদিনের জন্য মামাবাড়িতে এসেছে--তোদের এ কোন চেহারা ওই কচি মেয়েটাকে তোরা দেখাচ্ছিস। দূর হয়ে যা—দূর হয়ে যা—আমার সামনে থেকে। আমায় একটু একা থাকতে দে। একটু একা থাকতে দে।

[*বৃদ্ধা হাউহাউ করে কাঁদতে থাকেন।*]

মন।। কেঁদো না দিয়া কেঁদো না। মামারা তোমার অপারেশনের টাকা না দিলেও অপারেশন কিন্তু হবেই।

বৃদ্ধা।। কে দেবে টাকা? তোর মা-বাবা?

মন।। না দিয়া, আমি দেব।

বৃদ্ধা।। তুই আমায় টাকা দিবি! পাবি কোথায় টাকা?

মন।। প্রতিবার জন্মদিনে আমি অনেক টাকা পাই তো—চার বছর ধরে টাকা জমাচ্ছি—অনেক টাকা জমেছে আমার। সেই টাকায় তোমার অপারেশন হবে না দিয়া?

বৃদ্ধা।। সোনারে। এ তুই কি কথা শোনালি আমায়। আমার যে বুকের সব জ্বালা দূর হয়ে গেল। তোর মতো মন আর সবার হয় না কেন সোনা? আয়-আয় আমার বুকে আয়—আমার বুকে আয়!

[*নাটক শেষের আবহসঙ্গীতের সঙ্গে 'বেঙ্গমা বেঙ্গমীরে কয়···' ছড়া গানটির তিন-চার কলি বৃদ্ধার গলায় ভেসে আসে।*]

নতুন আলো

চরিত্র ❑ ধনপতি ।। মেজমামা ।। ছেলে

[*ধনপতি দত্তর প্রিয় বন্ধু ব্রজবিহারী হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন। সমবেত ক্রন্দন রোল।*]

ছেলে।। সর্বনাশ হয়ে গেল কাকাবাবু। বাবা যে এভাবে আমাদের সবাইকে ফেলে (কান্নায় কণ্ঠ বুজে আসে)—

ধনপতি।। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) আমি যে এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। কাল রাত ৮টা পর্যন্ত একসঙ্গে বসে তাস খেললাম, গল্পগুজব করলাম— আর আজ—

ছেলে।। সকালে উঠে বাবাকে দেখে আমরা কেউ বুঝিনি যে এতবড় অঘটন

ঘটবে। বাথরুম থেকে এসে চা খেল, বারান্দায় বসে পেপার পড়ল তারপর বলল বাজার যাব। জামা পরতে গিয়ে বলল বুকে ব্যথা তারপর শ্বাসকষ্ট। ডাক্তার ডাকার আগেই দশমিনিটে সব শেষ। (কেঁদে ফেলে)

ধনপতি।। কেঁদো না গোরা। মনটাকে শক্ত করো। তুমি ব্রজর বড়ছেলে। তোমাকে তো ঠিক থাকতেই হবে। শেষ কাজের দায়িত্ব যে তোমাকেই নিতে হবে।

ছেলে।। সে দায়িত্ব মামারাই নিয়েছেন। খাট, ফুল এসব আনতে ছোটমামা গেছেন। বড়মামা ম্যাটাডোরের খোঁজে গেছেন।

ধনপতি।। ওসব দায়িত্বর কথা বলছি না গোরা। তোমার বাবা প্রায়ই তার একটা শেষ ইচ্ছের কথা আমাদের বলতেন। আমাকে, কেষ্টবাবুকে, নীরোদবাবুকে—

ছেলে।। কী ইচ্ছে কাকাবাবু? বাবার শেষ ইচ্ছের কথা আপনি আমাকে বলুন— আমি নিশ্চয়ই রাখব।

ধনপতি।। তোমার বাবা মৃত্যুর পর তাঁর চোখদুটো যে আই ব্যাঙ্কে দান করতে চেয়েছেন—

মেজমামা।। জামাইবাবু আইব্যাঙ্কে চোখ দেবেন বলেছেন—কই আমরা তো এসব কিছু আগে শুনিনি—কিরে গোরা তুই কিছু জানিস—

ছেলে।। না মামা, আমি কিছু জানি না। তবে যদি সত্যি বাবা আই ব্যাঙ্কে চোখ দান করে থাকে—

ধনপতি।। করেনি। করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল মাত্র। সুযোগ আর পেলো না—

মেজমামা।। এসব ইচ্ছেটিচ্ছের বাস্তব জগতে কোন দাম নেই ধনপতিবাবু। জামাইবাবু যখন চোখ ডোনেট করেননি তখন এসব প্রশ্ন উঠছে কেন। ডোনেট করলে না হয় তখন দেখা যেত—

ধনপতি।। দেখো সরোজ—ব্রজ আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। আমি ওর মৃত্যুর পর মিথ্যে বলব না। আগে থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া না থাকলেও কিন্তু চোখ দান করা যায়। আবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও অনেকে চোখ দান করতে পারেন না। আসলে মানুষের মৃত্যুর পর তার ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপর তো তার নিজের কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে না—সিদ্ধান্ত নিতে হয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরই। কাজেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও নির্দিষ্ট

সময়ের মধ্যে আই ব্যাঙ্কে না জানালে তাঁরা তো আর চোখ নিতে পারবেন না। সারা বছর কত লিখিত প্রতিশ্রুতিই তো আই ব্যাঙ্কে জমা পড়ে, মারাও যান অনেকে, কিন্তু আই ব্যাঙ্কে চোখ জমা পড়ে কটা?

মেজমামা।। ধনপতিবাবু, আপনার এসব বক্তৃতা শোনার সময় আমাদের এখন নেই। মা-বাপ মরা ছেলে-মেয়ে, গোরা আর সোনার মাথায় দয়া করে এসব কথা ঢোকাবেন না।

ধনপতি।। তাহলে ব্রজর শেষ ইচ্ছেটাকে তোমরা সম্মান জানাবে না—

মেজমামা।। আশ্চর্য ব্যাপার! জামাইবাবুর শেষ ইচ্ছেটার কথা আর কেউ জানলো না, জানলেন শুধু আপনি।

ছেলে।। আমি বাবার স্যুটকেশ, তোষকের নীচে, হিসেবের খাতায়, আলমারিতে— সব জায়গাতেই খুঁজে দেখলাম—

মেজমামা।। কিন্তু পেলি না তো—

ছেলে।। না, কোথাও কিছু লেখা নেই—

মেজমামা।। পাবি না। কিছুতেই পাবি না। জামাইবাবুর খুব ক্লোজ ছিলাম আমি। বরাবরই। এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলে আর কেউ না জানুক আমি অন্তত জানতাম। ওইতো বড়দা খাট নিয়ে এল—যাই শেষ যাত্রার আয়োজন করি।

ছেলে।। আচ্ছা কাকাবাবু, বাবার চোখ দুটো তুলে নেওয়া হলে তো বীভৎস দেখতে লাগবে—আপনি প্রিয়বন্ধু হয়ে সে দৃশ্য সহ্য করতে পারবেন?

ধনপতি।। কেন বীভৎস লাগবে? চোখের পাতাদুটো ডাক্তারবাবুরা তো সেলাই করেই দেবেন। বোঝাই যাবে না যে চোখদুটো তুলে নেওয়া হয়েছে।

ছেলে।। তাছাড়া বাবার চোখদুটো তো ভাল নয়। দূরের জিনিস দেখতে পেত না বলে চশমা নিয়েছিল—আপনি তো সবই জানেন।

ধনপতি।। হ্যাঁ। এ ব্যাপারে জানবার জন্য তোমার বাবা, আমি আর কেষ্টবাবু একদিন মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে খোঁজ খবরও করে এসেছি। তিনজনে চোখ পরীক্ষা করিয়েও এসেছি। ওঁরা আগামী সপ্তাহে যেতে বলেছিল।

ছেলে।। বাবার চোখ তখন ঠিক ছিল?

ধনপতি।। নিশ্চয়ই। আসলে চোখের সামনে একটা স্বচ্ছ অংশ থাকে, কর্নিয়া।

শুধু ওইটুকু সুস্থ থাকলেই চোখ নেওয়া যেতে পারে। পুরো চোখটতো আর পাল্টানো যায় না। পাল্টানো যায় শুধু কর্নিয়াই।

ছেলে।। কর্নিয়া কাকে বলে আমি জানি কাকাবাবু। ক্লাস টেনে লাইফ সায়েন্সে পড়েছিও।

ধনপতি।। তবে আর তোমায় আমি কী বোঝাব? ওই টি.ভি.তে একটা প্রোগ্রাম দেখেই ব্রজর মাথায় চোখদানের প্ল্যানটা আসে। সেজন্যই মেডিক্যাল কলেজ আই ব্যাঙ্কে নিয়মকানুন জানতে গিয়েছিলাম। তুমি শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবে গোরা, অনেক অন্ধও চোখ দিতে পারে।

ছেলে।। সে কি! অন্ধ মানে সে তো নিজেই চোখে দেখে না, সে আবার চোখ দেবে কী করে?

ধনপতি।। মানুষ তো চোখের নানা অসুখেই অন্ধ হয়। বহু অন্ধ মানুষের রেটিনা নষ্ট হয়ে গেছে, চোখের নার্ভ নষ্ট হয়ে গেছে, সেজন্য সে দেখতে পাচ্ছে না, অথচ কর্নিয়াটুকু ঠিকই আছে—সে নিশ্চয়ই কর্নিয়াটা দিতে পারে।

ছেলে।। কাকাবাবু, অনেক তো দেরি হয়ে গেল। বাবার চোখ দুটো যদি এর মধ্যে নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে—

ধনপতি।। হয়নি। তোমার বাবা মারা গেছেন ঘণ্টা দেড়-দুই হয়েছে। পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে চোখ নিলেই হল।

ছেলে।। তাহলে আপনি সেই ব্যবস্থাই করুন কাকাবাবু। আমার বাবার এমন মহৎ একটা ইচ্ছে—বাবার চোখ দিয়ে একজন অন্ধ মানুষ আবার এই সুন্দর পৃথিবীটাকে দেখবে—আমি এ যুগের ছেলে হয়ে কেন সেটা মেনে নেব না? মায়ের অবর্তমানে আমিই অনুমতি দিচ্ছি—

ধনপতি।। শাবাশ গোরা, শাবাশ। আমি জানতাম তুমি রাজি হবেই। ব্রজ একটা কথা মাঝে মাঝেই বলতো, ধনপতি জীবনে আর কিছু না পারি, ছেলেটাকে কিন্তু মনের মতো করেই তৈরি করেছি—

ছেলে।। আপনি তাহলে আই ব্যাঙ্কে খবর দিন, এক্ষুনি।

ধনপতি।। সে কাজ আমি আগেই সেরে রেখেছি। ওই শোন অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন। মেডিক্যাল টিম আসছে আই ব্যাঙ্ক থেকে—ব্রজ হারিয়ে গেলেও ওর চোখ দুটো বেঁচে থাকবে—চিরকাল বেঁচে থাকবে।

[*অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন ও নাটক শেষের আবহসঙ্গীত ওভারল্যাপ করে।*]

রিক্তাকে নিয়ে চিঠি

(সম্পূর্ণ চিত্রনাটক)
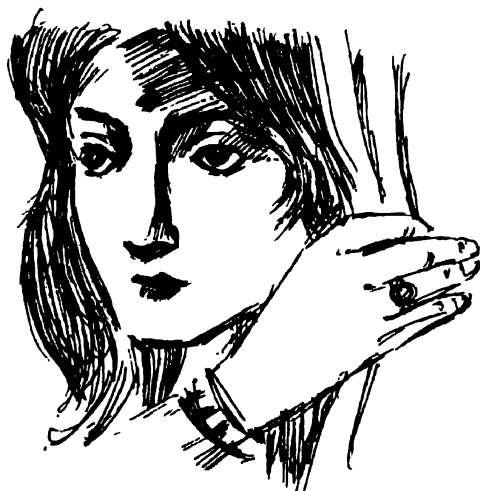
॥ চরিত্রাবলী ॥

❍ সৌম্য	...	...	বছর তিরিশের শিক্ষিত যুবক
❍ ডাঃ মিত্র	...	...	ক্যানসার হাসপাতালের কর্ণধার
❍ আশিস	...	...	ডাঃ মিত্রের জুনিয়র
❍ দাদু	...	...	হাসপাতালের রোগী
❍ কুশল	...	...	সৌম্যর বন্ধু
❍ শঙ্কর	...	...	সৌম্যর বন্ধু
❍ রানা	...	...	সৌম্যর বন্ধু
❍ সদানন্দ	...	...	গেস্ট হাউসের কেয়ারটেকার

○ ডাঃ কর	...	...	হাসপাতালের সার্জেন
○ মিঃ খান	...	...	ম্যারেজ রেজিস্ট্রার
○ রিক্তা	...	...	বছর পঁচিশের শিক্ষিতা যুবতী
○ সুতপা	...	...	হাসপাতালের রোগী
○ মাধুরীপিসি	...	...	হাসপাতালের রোগী
○ অর্কমিতা	...	...	হাসপাতালের শিশু রোগী
○ মালা	...	...	সদানন্দর প্রেমিকা
○ সিস্টার-১	...	...	হাসপাতালের সিস্টার
○ সিস্টার-২	...	...	হাসপাতালের সিস্টার
○ তৃষা	...	...	ডাঃ মিত্রর স্ত্রী

❑ অন্যান্য : ডাঃ মিত্র'র বাড়ির কাজের লোক, জনৈক রোগী, ফোটোগ্রাফার, গেস্ট হাউসের চাকর বঙ্কা, দু'-তিন জন ডাক্তার, সিস্টার ও ওয়ার্ড-বয়, অর্কমিতার মা।

● দৃশ্য ১ ।। ডাঃ মিত্র'র বাড়ির বাইরে। সময় ❑ দুপুর।

ডাঃ মিত্র। ব্যাক টু ক্যামেরা। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলিংবেল টেপেন।

● দৃশ্য ২ ।। ডাঃ মিত্র'র ড্রইংরুম। সময় ❑ দুপুর।

বন্ধ দরজা খুলে দেন ডাঃ মিত্র'র স্ত্রী তৃষা। ডাঃ মিত্র ঘরে ঢুকে সোফায় বসেন। মধ্যবিত্তর সাজানো-গোছানো ড্রইংরুম। উল্টোদিকে বা পাশের সোফায় বসেন স্ত্রী।

তৃষা।। আজ ফিরতে এত দেরি কেন?

ডাঃ মিত্র।। স্টাফদের সঙ্গে মিটিং ছিল। এক গ্লাস জল খাওয়াও তো—

তৃষা।। চিনু—স্যারকে এক গ্লাস জল দিয়ে যা। চা খাবে তো—

ডাঃ মিত্র।। এত বেলায় আর চা খাব না—চিঠিপত্র কিছু আসেনি?

তৃষা।। হ্যাঁ—ক্যুরিয়ারে একটা চিঠি এসেছে। আমি সই করে রেখেছি। দিচ্ছি—

তৃষা উঠে গিয়ে পাশের টেবিল থেকে চিঠি নিয়ে আসে। এই ফাঁকে চিনু ট্রে-তে করে এক গ্লাস জল এনে গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে চলে যায়। তৃষার হাত থেকে চিঠিটা নেয় ডাঃ মিত্র। প্রেরকের নাম-ঠিকানা পড়ে।

ডাঃ মিত্র।। সৌম্যকুমার চ্যাটার্জি। দীঘা। সৌম্য! যার কথা তোমায় বলেছিলাম তৃষা। (চিঠি বার করেন খাম ছিঁড়ে)

তৃষা।। সৌম্য নামে তো আমাদের কেউ—চিঠিটা পড়েই দেখ না।

চিঠি পড়তে থাকেন ডাঃ মিত্র। ভেসে আসে সৌম্যর গলা—

শ্রদ্ধাস্পদেষু স্যার, আমি সৌম্য লিখছি দীঘার এক গেস্ট হাউস থেকে। কী হল! চিনতে পারলেন না তো—আমি সেই সৌম্য—যার বিয়েতে আপনি সাক্ষী দিয়েছিলেন। কী হল! তাও মনে পড়ছে না। স্বাভাবিক। যা ব্যস্ত লোক আপনি! আচ্ছা আমার কথা মনে না থাক রিক্তার কথা মনে আছে তো? রিক্তা মানে আপনাদের হাসপাতালের সেই ব্রেস্ট ক্যানসারের পেশেন্ট...

ফ্ল্যাশ ব্যাক শুরু। ডাক্তারের চিঠিপড়ার ফাঁকে তৃষার রি-অ্যাকশনের একটা ক্লোজ-আপ। চিঠি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের ঢেউ এবং তার মধ্যে সৌম্যর মুখের ভেসে ওঠা—দেখাতে পারলে ভাল হয়।

● **দৃশ্য ৩ ।। ডাঃ মিত্র'র চেম্বার। সময় ❑ সকাল।**

ডাঃ মিত্র। ব্যাক টু ক্যামেরা। বেসিনে হাত ধুচ্ছেন। পাশে টাওয়েল হাতে দাঁড়িয়ে সিস্টার। হাত ধুয়ে বেসিনের কল বন্ধ করে সিস্টারের থেকে টাওয়েল নেন ডাঃ মিত্র। হাত মুছতে মুছতে সংলাপ বলেন। এরপর এসে নিজের চেয়ারে বসেন। উল্টোদিকের চেয়ারে বসে সৌম্য। সিস্টার বেরিয়ে যায়।

ডাঃ মিত্র।। পেশেন্ট আপনার কে হন?

সৌম্য।। আমার ভাবী স্ত্রী।

ডাঃ মিত্র।। কবে বিয়ে করছেন?

সৌম্য।। এ-মাসেই তো কথা ছিল—কিন্তু—

ডাঃ মিত্র।। অসুখটা কী আপনি তো জানেন।

সৌম্য।। মোটামুটি। মানে ওই হাউস ফিজিশিয়ান যা বলেছিলেন—

ডাঃ মিত্র।। এত দেরি করলেন কেন?

সৌম্য।। মানে!

ডাঃ মিত্র।। মানেটা খুবই সোজা। এসব রোগ যে দেরি করলে হু-হু করে বেড়ে যায়, তা তো আপনি জানেন।

সৌম্য।। তা জানি। কিন্তু ও মানে রিক্তা আগে আমায় কিছুই জানায়নি।

ডাঃ মিত্র।। আপনার ভাবী স্ত্রী তো শিক্ষিতা মেয়ে। কোন প্রাইমারি স্কুলে পড়ায় বলল—

সৌম্য।। হ্যাঁ ডাক্তারবাবু—ও কিন্তু আগেই টের পেয়েছিল।

ডাঃ মিত্র।। তবু জানায়নি!

সৌম্য।। না।

ডাঃ মিত্র।। তাহলে আপনি জানলেন কী করে? ও'র মা-বাবার থেকে?

সৌম্য।। ওর মা-বাবা কেউই নেই। ছোটবেলায় দুজনকেই হারিয়েছে। আত্মীয়-স্বজনও না থাকার মতোই। আসলে ও সব দিক থেকেই রিক্তা।

ডাঃ মিত্র।। আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না।

সৌম্য।। দিচ্ছি—ডাক্তারবাবু। রিক্তা একটি বাড়িতে পেয়িংগেস্ট থাকে। আমি মাঝে-মাঝেই অফিস-ফেরত ওখানে যেতাম। সবাই আমাদের রিলেশনটা জানত—কাজেই—একদিন বিকেলবেলা

● দৃশ্য ৪ ।। রিক্তার হোস্টেলরুম। সময় ❑ বিকেল।

হোস্টেলের একটি ঘর। বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় রিক্তা। হাতে বই। পরনে ম্যাক্সি। দরজায় কেউ নক করে।

রিক্তা।। খোলা আছে। চলে এসো।

দরজার পাল্লা খুলে ঘরে ঢোকে সৌম্য। কথা বলতে বলতে এসে রিক্তার বিছানার পাশে দাঁড়ায়।

সৌম্য।। তুমি এখনও শুয়ে আছ। সাড়ে ছ'টায় শো। রেডি হবে কখন।

রিক্তা।। ধুর। আজকে আর বেরোতে ইচ্ছে করছে না।

সৌম্য।। বেরোতে ইচ্ছে করছে না মানে! টিকিট দুটোর কী হবে!

রিক্তা।। ছিঁড়ে ফেলবে। অনেক টাকা রোজগার করো তুমি। কুড়ি টাকা নষ্ট হলে কি-ই বা এসে যাবে।

সৌম্য।। (রিক্তার চৌকিতে বসে) কী হয়েছে বলো তো তোমার—তুমি নিজেই বললে বহুদিন গ্রুপ থিয়েটারের নাটক দেখ না—অথচ···

রিক্তা।। কিছুই হয়নি। সুচেতাদি দলবল নিয়ে সিনেমায় গেছে। বাড়িতে শুধু আমি আর মাসিমা। তাই ভাবলাম আজ চুটিয়ে আড্ডা মারব—

সৌম্য।। হ্যাঁ। বলছ কী সুন্দরী—শুধু আমি আর তুমি—

রিক্তা।। না মশাই মাসিমাও আছে।

সৌম্য।। গুলি মারো মাসিমাকে। হাম-তুম এক কামরা মে বন্ধ হো অউর চাবি খো যায়—

গান গাইতে-গাইতে সৌম্য রিক্তার দিকে এগোতে থাকে।

রিক্তা।। এই কী হচ্ছে।

সৌম্য।। কিছুই হয়নি—এবার হবে—

রিক্তা।। কী হবে।

সৌম্য।। কী হবে জানো না—

রিক্তা।। ভাল হবে না কিন্তু—দরজা খোলা রয়েছে।

সৌম্য।। দরজা লজ্জা পেয়ে নিজে-নিজেই বন্ধ হয়ে যাবে।

সৌম্য রিক্তাকে কাছে টেনে নেয়। আদর করতে থাকে।

রিক্তা।। এই কি হচ্ছে ছাড়ো না। ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। ছাড়ো—ছাড়ো বলছি

সৌম্য।। (আদর করতে করতে) না ছাড়ব না, কিছুতেই ছাড়ব না—আমি কি পরের সম্পত্তিতে ভাগ বসিয়েছি। বল আমি কি—

সৌম্য যখন ওপরের কথাগুলো আদর করতে করতে বলে, তখন ক্লোজ-আপে রিক্তার যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখটা ধরা পড়ে। রিক্তা জোর করে যন্ত্রণা আটকানোর চেষ্টা করে। পারে না। আর্ত চিৎকার করে ওঠে।

রিক্তা।। আঃ সৌম্য প্লিজ—

রিক্তার চিৎকার শুনে সৌম্য রিক্তাকে ছেড়ে উঠে বসে।

সৌম্য।। কী হল! তোমার কি ব্যথা লাগল—

রিক্তা।। (যন্ত্রণা চেপে রেখে) না—কিছু হয়নি—

সৌম্য।। হয়নি মানে, নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে—কী হয়েছে? কেন তুমি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলে?

রিক্তা।। বলছি তো কিছু হয়নি। কেন এমন পাগলামি করছ?

সৌম্য।। পাগলামি আমি করছি না। তুমি আমার কাছে কিছু গোপন করছ। ওখানে তোমার কী হয়েছে?

সৌম্য ধীরে ধীরে রিক্তার দিকে এগিয়ে আসে। দুটো কাঁধ ধরে।

রিক্তা।। আঃ সৌম্য—কি হচ্ছে মাসিমা এসে পড়বে—প্লিজ তুমি—শোন সৌম্য—

সৌম্য রিক্তার ম্যাক্সির ওপর অংশের বাম দিক ধরে আচমকা টান মারে। শার্প কাট করে দেখা যায় সৌম্যর মুখ বিগ ক্লোজ-আপে।

সৌম্য।। মাই গড!

সৌম্যর মুখের ওপরেই আছড়ে পড়ে বিরাট গর্জন করে সমুদ্রের ঢেউ।

দৃশ্য ৫ ।। ডাঃ মিত্র'র চেম্বার। সময় ❑ সকাল।

ফ্ল্যাশ ব্যাক শেষ। ডাঃ মিত্র'র চেম্বারে আগের মতো মুখোমুখি বসে সৌম্য ও ডাঃ মিত্র।

ডাঃ মিত্র।। তারপর।

সৌম্য।। তারপর আর কী! ওকে জোর করেই নিয়ে গেলাম আমাদের হাউস ফিজিশিয়ানের কাছে। তিনিই আপনার কাছে পাঠালেন।

ডাঃ মিত্র।। হুম। একটা জিনিস আমার আশ্চর্য লাগছে, ভদ্রমহিলা যখন আগেই টের পেয়েছিলেন যে রোগটা গোলমেলে তখন আপনাকে না জানিয়েও তো কোনও ডাক্তার দেখাতে পারতেন।

সৌম্য।। দেখিয়েছিলেন। হোমিওপ্যাথি।

ডাঃ মিত্র।। ও—আচ্ছা। ঠিক আছে—যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে—ও নিয়ে আর অনুশোচনা করে লাভ কী! লেট্‌স লুক ফরোয়ার্ড। **টেবিলের ওপর রাখা বেল বাজান ডাঃ মিত্র। প্রবেশ করেন সিস্টার।** আপনি ডাঃ আচার্যকে একবার এখানে পাঠিয়ে দিন তো।

সিস্টার ঘাড় কাত করে সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে যায়।

সৌম্য।। কেসটা খুব অ্যাডভান্সড—তাই না স্যার।

ডাঃ মিত্র।। অ্যাডভান্স তো বটেই। তবে চিকিৎসার বাইরে নয়।

সৌম্য।। অপারেশন করা যাবে না!

ডাঃ মিত্র।। না, সেই স্টেজ আর নেই। তবে রেডিয়েশন আর কেমো দেওয়া যাবে।

সৌম্য।। আজ থেকেই দেবেন।

ডাঃ মিত্র।। আরে না, না—আগে এফ. এন. এ. সি. করে রোগটা কনফার্ম করি।

সৌম্য।। এফ. এন. এ. সি. মানে!

ডাঃ মিত্র।। ওখান থেকে সুচ ফুটিয়ে একটু রস নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা আর কি! বলতে পারেন এক ধরনের বায়োপসি।

দরজা ঠেলে প্রবেশ করে ডাঃ আশিস আচার্য।

আশিস।। আপনি ডেকেছেন, স্যার?

ডাঃ মিত্র।। হ্যাঁ—আশিস, আজ এখুনি এফ. এন. এ. সি. করে দেওয়া যাবে না—

আশিস।। হ্যাঁ স্যার—আমি নিজে করে দিচ্ছি। কোথা থেকে?

ডাঃ মিত্র।। ফ্রম লেফট ব্রেস্ট।

আশিস।। পেশেন্ট কোথায়?

ডাঃ মিত্র।। এই ভদ্রলোকের ভাবী স্ত্রী।

আশিস।। আপনি ওনাকে নিয়ে আট নম্বর ঘরে আসুন। আমি আসি স্যার।

ডাঃ মিত্র।। এসো।

আশিস বেরিয়ে যায়।

সৌম্য।। রিক্তা আর বাঁচবে না—তাই না স্যার?

ডাঃ মিত্র।। আমাদের উদ্যোগ দেখে কি তাই মনে হচ্ছে। এই তো এখুনি বায়োপসি হয়ে যাবে। কালকেই রিপোর্ট পেয়ে যাবেন। আলট্রাসোনোগ্রাম, চেস্ট এক্স-রে, ব্লাড—এসবও আগামীকালই হয়ে যাবে। পরশুদিন ডাক্তারদের বোর্ড বসবে। তারপরই ট্রিটমেন্ট শুরু হবে।

সৌম্য।। এত করেও যদি কিছু না হয়—

ডাঃ মিত্র।। কেন হবে না। কিছু নিশ্চয়ই হবে। আপনি তো মশাই ইয়ংম্যান। এত অল্পে ভেঙে পড়লে চলে। আমরা সবাই আপনার পাশে আছি। তাছাড়া আপনি ভেঙে পড়লে, রিক্তা দেবীর অবস্থা কি হবে—ভেবে দেখেছেন?

সৌম্য।। কিছুই ভাবতে পারছি না স্যার। রিক্তার তো নিজের বলতে আমি ছাড়া কেউই নেই।

ডাঃ মিত্র।। সেজন্যই তো আপনাকে স্টেডি থাকতে হবে। যান আট নম্বর ঘরে গিয়ে ডাঃ আচার্যর সঙ্গে মিট করুন। আমি সিস্টারকে ডেকে বাকি ডিরেকশনগুলো লিখে দিচ্ছি। আপনাকে বুঝিয়ে দেবে।

সৌম্য।। (চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়) ধন্যবাদ স্যার।

ধীর পায়ে দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

দৃশ্য ৬ ।। হাসপাতালের করিডোর। সময় ☐ দুপুর।

হাসপাতালের করিডোরের একটি বেঞ্চে বসে আছে রিক্তা। দু'-একজন সিস্টার-স্টাফ করিডোর দিয়ে যাতায়াত করছে। সৌম্য ধীর পায়ে এগিয়ে আসে রিক্তার দিকে। রিক্তা উঠে দাঁড়ায়। সৌম্য রিক্তার পাশে দাঁড়ায়। কোনও কথা বলে না। কয়েক

সেকেন্ড বাদে রিক্তাই প্রথম কথা বলে।

রিক্তা।। কী হল, কোনও কথা বলছ না—ডাক্তারবাবু কী বললেন—

সৌম্য।। (একটু ইতস্তত করে) এ তুমি কী করলে রিক্তা! তুমি কি জানো না যে প্রথম পর্যায়ে ধরা পড়লে এ-রোগ সম্পূর্ণ সেরে যায়—তুমি—তুমি (কান্নায় গলা ধরে আসে)

রিক্তা।। (নির্লিপ্ত গলায় বলে) তাহলে আমার রোগটা আর প্রথম পর্যায়ে নেই—তাই তো

সৌম্য।। না নেই—আর সেজন্য—

রিক্তা।। নেই তো নেই—এতো ভেঙে পড়ছ কেন। আজ নয় কাল সবাইকেই তো মরতে হবে। আর আমি তো আজন্ম মরেই ছিলাম। হঠাৎ করে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো এসে তুমি আমার জীবনে আছড়ে না পড়লে—

সৌম্য।। কি হল আছড়ে পড়ে। তোমাকে তো ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারলাম না। অথচ তুমি—

রিক্তা।। তুমি এমন করছ যেন রোগটা তোমারই হয়েছে।

সৌম্য।। হলে তো ভালই হত, ঠিক সময়ে ঠিক চিকিৎসা করাতাম—আর তুমি তো কোনও চিকিৎসাই করাতে চাইছ না—

রিক্তা।। আমি চিকিৎসা করাতে রাজি হলে তুমি খুব খুশি হবে, তাই না—

সৌম্য।। জানি না। তবে ট্রিটমেন্ট এখুনি শুরু করতে বললেন ডাঃ মিত্র। আর দেরি করলে—

রিক্তা।। দেরি করব না—এখন থেকে তুমি যা-যা বলবে সব শুনব—দেখো যদি এ-যুগের পুরুষ-সাবিত্রী হয়ে এই মহিলা সত্যবানকে ফিরিয়ে আনতে পারো। প্রমিস।

সৌম্য ম্লান মুখে হাসে। দৃশ্য শেষ হয়।

দৃশ্য ৭ ।। হাসপাতালের বোর্ড রুম। সময় ❑ দুপুর।

হাসপাতালের বোর্ড রুম। বড় গোলটেবিল ঘিরে বসে আছেন জনা ছয়েক ডাক্তার। মধ্যমণি ডাঃ মিত্র। তাঁর গোটা তিনেক চেয়ার বাদে ডাঃ আশিস আচার্য বসে আছেন। সামনে রোগীদের ফাইলপত্র ছড়ানো। পাশে দাঁড়িয়ে একজন রোগী এবং সিস্টার।

আশিস।। আপনি বাড়ি থেকে যাতায়াত করে রে নিতে পারবেন?

রোগী।। একটা বেডের ব্যবস্থা হলে ভাল হয়। বড় দুর্বল শরীর।

আশিস।। কিন্তু আজ তো জেনারেল বেড খালি নেই। কাল সকাল এগারোটায় একবার আসুন।

রোগী।। দেখবেন ডাক্তারবাবু, কাল যেন ফিরে যেতে না হয়। নমস্কার।

ডাক্তারকে নমস্কার করে বেরিয়ে যায়।

আশিস।। সিস্টার, নেক্সট পেশেন্ট, রিক্তা ব্যানার্জি—

সিস্টার।। (দরজা ফাঁক করে মুখ বার করে ডাকে) রিক্তা ব্যানার্জি আসুন।

সিস্টার দরজা টেনে ধরে। প্রবেশ করে রিক্তা ও সৌম্য।

আশিস।। (পাশের চেয়ার দেখিয়ে রিক্তাকে বসতে বলে। সৌম্য দাঁড়িয়ে থাকে) বসুন।

ডাঃ মিত্র।। ডাঃ কর আপনি তো কেসটা দেখেছেন।

ডাঃ কর।। হ্যাঁ। লেফ্‌ট ব্রেস্টে গ্রোথ রয়েছে। অ্যাক্সিলারি নোডেও ইনভলমেন্ট আছে। এখুনি সার্জারির কোনও স্কোপ নেই। আশিস, বায়োপসি রিপোর্টটা দাও তো।

আশিস ফাইল এগিয়ে দেয়। ডাঃ কর ফাইল দেখেন। তারপর পাশে বসা ডাঃ মিত্রর দিকে এগিয়ে যান।

ডাঃ মিত্র।। আপনি সাজেস্ট করুন, কী করবেন? পেশেন্ট তো আপনার আন্ডারেই—

ডাঃ কর।। সার্জারির যখন স্কোপ নেই, আপনার আন্ডারেই থাক। একটা কেমোথেরাপির কোর্স দিয়ে তারপর রেডিয়েশন চলুক।

ডাঃ মিত্র।। (আশিসকে ফাইলটা এগিয়ে দেয়) আশিস তুমি তাহলে বোর্ড ডিসিশন লিখে অ্যাডমিশনের ব্যবস্থা করে দাও।

আশিস।। (সৌম্যকে বলে) জেনারেল বেড তো নেই। কেবিন কিংবা কিউবিক্যাল নেবেন। পরে জেনারেল বেডে ট্রান্সফার করে দেব।

সৌম্য।। হ্যাঁ। যা পাওয়া যাবে তাই নেব।

আশিস।। তাহলে বাইরে ওয়েট করুন। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

সৌম্য ও রিক্তা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সিস্টার দরজা খুলে দেয়।

দৃশ্য ৮ ।। হাসপাতালের ওয়ার্ড। সময় ❑ বিকেলবেলা।

ক্যানসার হাসপাতালের ওয়ার্ড। গোটা চারেক বেড। একটি বেডে শুয়ে আছে রিক্তা। স্যালাইন চলছে। সিস্টার একটি ইঞ্জেকশন পুশ করে।

সিস্টার।। এবার আসতে পারেন।

সৌম্য এগিয়ে এসে বেডের পাশে দাঁড়ায়।

এবার সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত যত খুশি গল্প করুন, কেউ ডিসটার্ব করবে না। তবে যাবার আগে ডাঃ আচার্য'র সঙ্গে একবার দেখা করে যাবেন কিন্তু। আসি।

সিস্টার ইঞ্জেকশন দেবার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বার হয়ে যায়।

রিক্তা।। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো।

সৌম্য।। (পাশের টুলে বসে) ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তাই না, এত কড়া কড়া ইঞ্জেকশন!

রিক্তা।। এখন পর্যন্ত আমার কোনও কষ্টই নেই। পরে হয়তো হবে। তবে সামলে নেব। তুমি চিন্তা করো না।

সৌম্য।। কেমন লাগছে এখানকার পরিবেশ—।

রিক্তা।। ভাল, ভীষণ ভাল।

সৌম্য।। ভাল! বলছ কী! হাসপাতালের পরিবেশ কখনও ভাল হয় নাকি! এ তো কয়েদখানা।

রিক্তা।। না। কয়েদখানায় কাটিয়েছি আমি জীবনের অনেকগুলো বছর। সেই কারখানার নাম দ্য অরফ্যান হোম। জানো, এই ওয়ার্ডে সবার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেছে।

সৌম্য।। মাত্র দু'দিনেই।

রিক্তা।। ওই যে ছোট্ট মেয়েটি, মার সঙ্গে বসে আঙুর খাচ্ছে (ক্লোজ-আপে মা ও মেয়েকে দেখা যায়) ওর নাম অর্কমিতা। কি মিষ্টি নাম বলো—

সৌম্য।। কী হয়েছে ওর?

রিক্তা।। জানি না তো, ডাঃ আচার্যকে জিজ্ঞেস করে বলব। আর ওই বেডে যে মেয়েটি শুয়ে আছে ওর নাম সুতপা। ভীষণ ভাল ভরতনাট্যম নাচত। রবীন্দ্রসদনে প্রোগ্রাম করতে গিয়ে পায়ে চোট পায়। তারপরেই—

ক্লোজ-আপে সুতপাকে দেখা যায়। বিষণ্ণ মুখ। পাশের টুলে একটি ছেলে বসে আছে।

সৌম্য।। ছেলেটি কে?

রিক্তা।। জানি না তো, কালও এসেছিল। বোধহয় তোমার মতোই হতভাগ্য কোনও প্রেমিক। আর ওই যে বেডটা খালি দেখছ, ওটা মাধুরী পিসির।

সৌম্য।। মাধুরী পিসি।

রিক্তা।। হ্যাঁ এখানে সবাই ওকে ওই নামেই ডাকে। বড় দুখী মানুষ। রোজ ভিজিটিং আওয়ার্সে বারান্দায় গিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে, যদি ওর বাড়ির লোক কেউ আসে।

সৌম্য।। কেউ নেই ওনার?

রিক্তা।। হ্যাঁ শুনেছি সবাই আছে। ছেলেরাই তো দিন দশেক আগে নাকি ভর্তি করে দিয়ে গেছে। তারপর আর কেউ আসেনি—

সৌম্য।। ঠিকানা নেই। হাসপাতাল থেকে খবর পাঠাচ্ছে না কেন?

রিক্তা।। ছেলেরা যে ঠিকানা দিয়েছিল, সেটা নাকি ভুল। ভদ্রমহিলা ব্রেন টিউমারের রোগী, সব কথা গুছিয়ে বলতে পারেন না।

সৌম্য।। স্ট্রেঞ্জ! তুমি দু'দিনেই সবার সব খবর জোগাড় করে ফেলেছ।

রিক্তা।। আমার খবরও সবাই নিয়েছে। এমনকি তোমার খবরও। দেখলে না তুমি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অর্কমিতার মা আর সুতপা কেমনভাবে তোমার দিকে তাকাল।

সৌম্য।। তাই বুঝি। অনেক কথা বলেছ। এবার একটু রেস্ট নাও। আমি দেখি ডাঃ আচার্যর সঙ্গে দেখা হয় কি না।

সৌম্য বার হয়ে যায়। দৃশ্য শেষ।

দৃশ্য ৯ ।। হাসপাতালের করিডোর। সময় ❑ সন্ধ্যা।

হাসপাতালের করিডোরে দু'দিক থেকে হেঁটে আসে মাধুরী পিসি ও সৌম্য। মুখোমুখি দাঁড়ায়। বৃদ্ধা অদ্ভুত ঘোলাটে দৃষ্টিতে সৌম্যকে দেখে।

সৌম্য।। কী দেখছেন।

মাধুরী।। তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।

সৌম্য।। আমি কিন্তু আপনাকে চিনি। আপনি আমাদের সবার মাধুরী পিসি।

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বৃদ্ধার চোখ-মুখ।

মাধুরী।। আমার একটা উপকার করবে, বাবা।

সৌম্য।। আপনি বলুন।

মাধুরী।। আমার দুই ছেলে। সনাতন আর পঞ্চানন। বড় ভাল ছেলে। তবে বড্ড ব্যস্ত তো নানা কাজে। আসবার সময় পায় না। ওদের একটু খবর দেবে বাবা আসার জন্য।

সৌম্য।। কী বলব?

মাধুরী।। বলবে ওরা না এলে এখেনে আমার চিকিচ্ছে হবে না। ওরা যেন অনেক টাকা নিয়ে শিগ্‌গির করে চলে আসে। মনে করে বলো কিন্তু—

সৌম্য।। নিশ্চয়ই বলব। কিন্তু আপনার ঠিকানাটা।

মাধুরী।। ঠিকানা।

সৌম্য।। হ্যাঁ—আপনার ছেলেরা কোথায় থাকে, সেটা না জানলে তো—

মাধুরী।। ও হ্যাঁ তাও তো বটে!

হঠাৎ ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হওয়ার ঘণ্টা বাজে। ঢং-ঢং করে ছ'বার। বৃদ্ধাক দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকান।

এই রে, ছ'টা বেজে গেল। ঠাকুরঘরে সন্ধ্যাবাতি জ্বালাতে হবে। দিলে তো আমার দেরি করে। পথ ছাড়ো। পথ ছাড়ো। ও বউমা—বউমা—পঞ্চা ফিরেছে—

বৃদ্ধা দ্রুত চলে যায়। সৌম্য আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে।

দৃশ্য ১০ ।। হাসপাতালের কেবিন। সময় ❑ সকাল।

হাসপাতালের একটি কেবিন। এক বৃদ্ধ বেডের পাশে হামাগুড়ি দিচ্ছেন। কয়েক সেকেন্ড বাদে সিস্টার কেবিনে ঢুকে দাদুকে ওই অবস্থায় দেখে হেসে ফেলেন। সিস্টারের হাতে ওষুধের ট্রে।

সিস্টার।। দাদু, ও দাদু, আপনি মেঝেতে কী করছেন?

দাদু।। দেখতেই তো পারছ, কী করছি।

সিস্টার।। দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু বুঝতে পারছি না।

দাদু।। হামাগুড়ি দিচ্ছি, হামাগুড়ি।

(বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায়, বেডে বসে)

কাজের সময় এত ডিসটার্ব করো না।

সিস্টার।। হামাগুড়ি! এই বয়েসে! আপনি কি শিশু হয়ে গেলেন?

দাদু।। বৃদ্ধ মাত্রই শিশু।

সিস্টার।। কিন্তু আপনি তো বৃদ্ধ নন। আপনি তো সুইট এইটটি!

দাদু।। কে বলল?

সিস্টার।। আপনিই তো বলেন।

দাদু।। বলেছি বুঝি! বেশ করেছি। তোমার কোনও আপত্তি আছে?

সিস্টার।। না, না, আমার আপত্তি থাকবে কেন? আর থাকলেই কি আপনি শুনবেন?

দাদু।। আমি! কারও আপত্তি জীবনে কোনওদিন শুনেছি আমি!

সিস্টার।। আচ্ছা দাদু, একটা প্রশ্ন করব—উত্তর দেবেন?

দাদু।। আগে প্রশ্নটা শুনি।

সিস্টার।। আপনি হামাগুড়ি দিচ্ছিলেন কেন?

দাদু।। প্র্যাকটিশ করছিলাম।

সিস্টার।। প্র্যাকটিশ!

দাদু।। হ্যাঁ। কদিন বাদেই তো আমার ছুটি হয়ে যাচ্ছে। বাড়ি গিয়ে নাতিটার সঙ্গে ঘোড়া-ঘোড়া খেলতে হবে না! অসুস্থ বলে ও কি আমায় ছাড়বে! পিঠে উঠেই বলবে, এই ঘোড়া হ্যাট-হ্যাট— এজন্যই প্র্যাকটিশ করছি, বুঝলে?

সিস্টার।। বুঝলাম। জানেন দাদু আমাদের ফিমেল ওয়ার্ডে না একজন নতুন অতিথি এসেছেন।

দাদু।। কবে?

সিস্টার।। গত পরশু।

দাদু।। সে কি! আমাকে তো কেউ জানায়নি। আমি হলাম পেশেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট—

সিস্টার।। এই তো আমি জানালাম।

দাদু।। সে তো দু'দিন পরে। ঠিক আছে পেশেন্টকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আমি ইন্টারভিউ নেব।

সিস্টার।। আসতে পারবে না দাদু। গতকাল কেমোথেরাপি দেওয়া হয়েছে। বারে বারে বমি করছে।

দাদু।। সে কি! ডাক্তার করছেটা কী! না-না এ কেস আমাকেই দেখতে হবে। তুমি ভদ্রমহিলাকে খবর দাও প্রেসিডেন্ট সাহেব নিজে তাকে দেখতে আসছেন। যাও।

(সিস্টার বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই)

এই মেয়ে, যেজন্য এসেছিলে, তাই তো দিলে না।

সিস্টার।। ও হ্যাঁ তাই তো—এই আপনার ওষুধ।

বৃদ্ধের হাতে ওষুধ দিয়ে বেরিয়ে যায়। দৃশ্য শেষ।

দৃশ্য ·১১ ।। সিস্টার্স রুম। সময় ❑ দুপুর।

সিস্টার্স রুমে পেশেন্টের ফাইলে ডাঃ আশিস আচার্য কিছু লিখছেন। পাশে দাঁড়িয়ে দুজন সিস্টার।

সিস্টার-১।। ডাঃ আচার্য কি খুব ব্যস্ত।

আশিস।। কেন বলুন তো!

সিস্টার-২।। না মানে আজকাল তো আর আমাদের সঙ্গে বেশি কথা বলার সময় পান না—

সিস্টার-১।। কি করে পাবেন, আজকাল ওয়ার্ডে যা পেশেন্টের ভিড় বাড়ছে!

আশিস।। হ্যাঁ—ঠিকই বলেছেন।

সিস্টার-২।। বিশেষ করে ফিমেল ওয়ার্ডে। অল্পবয়সী মেয়েদের মধ্যে এ-রোগটা খুব বাড়ছে—তাই না, ডাঃ আচার্য?

আশিস।। হ্যাঁ—স্যারও সেদিন একই কথা বলছিলেন। এ-নিয়ে রিসার্চ হওয়া উচিত।

সিস্টার-১।। আপনিই রিসার্চটা শুরু করুন না ডাঃ আচার্য!

সিস্টার-২।। আমরাই না হয় আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট হব।

সিস্টার-১।। কি নেবেন তো আমাদের? বলুন না নেবেন কি না!

একজন ওয়ার্ড-বয় ঘরে ঢোকে আচমকাই।

ওয়ার্ড-বয়।। স্যার—রাউন্ডে এসেছেন। আপনাদের ডাকছেন।

আশিস।। এই যে রিসার্চ পরে হবে—এবার একজন ফাইলগুলো নিয়ে রাউন্ডে চলুন আমার সঙ্গে।

আশিস বেরিয়ে যায়। দৃশ্য শেষ।

দৃশ্য ১২ ।। ফিমেল ওয়ার্ড। সময় ❑ দুপুর।

ডাঃ মিত্র রিক্তার বেডের পাশে দাঁড়িয়ে। রিক্তা বেডে শুয়ে আছে। ডাঃ মিত্রর সঙ্গে ডাঃ আচার্য ও একজন সিস্টার।

ডাঃ মিত্র।। কেমন আছ?

রিক্তা।। ভাল। তবে খুব উইক লাগছে।

ডাঃ মিত্র।। আর বমি হয়নি তো?

আশিস।। না, তবে গা মাঝে মাঝে গোলাচ্ছে।

ডাঃ মিত্র।। আশিস রক্তের রিপোর্ট এসেছে?

রিক্তা।। হ্যাঁ স্যার—সব কাউন্টই নরম্যাল।

ডাঃ মিত্র।। ফা-ই-ন। তুমি তো তাহলে ফার্স্ট রাউন্ড উৎরে গেলে।

রিক্তা।। ফাইনাল রাউন্ড এখনও কত দূর স্যার।

ডাঃ মিত্র।। অনেকটাই দূর। তবু লড়াই করার মানসিকতা হারিয়ে ফেল না রিক্তা। হারার আগেই হেরে বসো না। ওই মেয়ে দুটোর দিকে তাকিয়ে দেখ।

রিক্তা।। আমিও তো হারতে চাই না স্যার। কিন্তু ট্র্যাকে আমি যখন দৌড় শুরু করলাম—তখন দেখলাম সবাই—সবাই আমাকে ফেলে অনেকটা এগিয়ে গেছে—আর আমি—

ডাঃ মিত্র।। আমরা সবাই তোমার পাশে আছি রিক্তা। দু'-এক দিনের মধ্যেই রেডিয়েশন শুরু হয়ে যাবে। তুমি নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে।

ডাঃ মিত্র সদলবলে পাশের বেডের দিকে এগিয়ে যান।

ডাঃ মিত্র।। (সুতপাকে) কি রে পাগলি কেমন আছিস। কাল তোর অপারেশন, জানিস তো? কি রে কথা বলছিস না কেন।

সুতপা।। আমার পা'টা পুরো কেটে বাদ দিয়ে দেবেন!

ডাঃ মিত্র।। আরে না-না, কিছুটা বাদ দিতে হবে।

সুতপা।। তাহলে আমি তো আর নাচতে পারব না—

ডাঃ মিত্র।। কিছুদিন হয়তো পারবি না, তারপর।

সুতপা।। অপারেশন না করে কিছু হয় না—

ডাঃ মিত্র।। না। পায়ের চেয়ে প্রাণ যে অনেক বড়। বেঁচে থাকলে নাচ ছাড়া আরও অনেক কিছু করা যাবে।

সুতপা।। কিন্তু আমি যে নাচ ছাড়া বাঁচতে চাই-না স্যার।

ডাঃ মিত্র।। বেশ, তাহলে তাই হবে। সুধাচন্দ্রনের কথা তো জানিস। কাঠের পায়ে নেচে-অভিনয় করে সারা দেশকে একবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। তুইও পারবি সুতপা। তাছাড়া ডাঃ করের মতো একজন বিখ্যাত সার্জেন নিজে হাতে তোর অপারেশন করবে।

সুতপা।। আপনি থাকবেন না?

ডাঃ মিত্র।। হ্যাঁ আমিও থাকব অপারেশন থিয়েটারে। আশিস ওর রক্তের রিকুইজিশন করেছ।

আশিস।। হ্যাঁ স্যার! বাড়ির লোক আনতে গেছে। বিকেলে পেয়ে যাব।

ডাঃ মিত্র।। চলি রে পাগলি—মন খারাপ করিস না—

ডাঃ মিত্র, ডাঃ আশিস আচার্য ও সিস্টার ওয়ার্ড ছেড়ে বেরিয়ে যান। দৃশ্য শেষ।

দৃশ্য ১৩ ।। হাসপাতালের করিডোর। সময় ❑ দুপুর।

ফুলের বোকে হাতে দাঁড়িয়ে আছে অর্কমিতা। ডাঃ মিত্র ও ডাঃ আচার্য এগিয়ে আসেন ওর দিকে।

ডাঃ মিত্র।। এ কি! তুমি ওয়ার্ডের বাইরে কী করছ?

অর্কমিতা।। তোমার জন্য ওয়েট করছিলাম আঙ্কেল!

(ফুলের বোকে এগিয়ে দেয়)

হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ—মেনি হ্যাপি রিটার্নস অব দি ডে।

ডাঃ মিত্র।। (বোকেটা নিয়ে অর্কমিতার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন) বিচ্ছু বুড়ি, তুই কি করে জানলি আজ আমার জন্মদিন—

অর্কমিতা।। মা বলল যে!

ডাঃ মিত্র।। মা কী করে জানল?

অর্কমিতা।। সিস্টার পিসিরাই তো মাকে বলেছে।

ডাঃ মিত্র।। আচ্ছা—এই ব্যাপার—

অর্কমিতা।। আচ্ছা আঙ্কেল, আমার জন্মদিনে তুমি আমাদের বাড়ি আসবে?

ডাঃ মিত্র।। কবে তোর জন্মদিন?

অর্কমিতা।। পয়লা এপ্রিল।

ডাঃ মিত্র।। তার মানে এপ্রিল ফুল! সে তো এখনও সাত-আট মাস দেরি আছে। আমাকে আরেকবার মনে করিয়ে দিস, কেমন।

অর্কমিতা।। আমাকে কী গিফ্‌ট দেবে?

ডাঃ মিত্র।। তুই যা চাইবি, তাই দেব।

অর্কমিতা।। তাহলে আমি একটু ভেবে নিই, তোমায় পরে বলব। আমি যাই আঙ্কেল।

ডাঃ মিত্র অর্কমিতার মাথায় চুমু খান।

ডাঃ মিত্র।। এসো।

অর্কমিতা চলে যায়। ডাঃ মিত্র ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। এরপর আশিসের দিকে তাকান।

আশিস।। ডাক্তার হয়ে আমাদের প্রতিদিন কত মিথ্যা কথা বলতে হয়, তাই না স্যার।

ডাঃ মিত্র।। হঠাৎ এই প্রশ্ন করছ?

আশিস।। এই যে মেয়েটিকে আপনি বললেন আগামী জন্মদিনে ওর বাড়ি যাবেন, গিফ্‌ট দেবেন—অতদিন কি ও বাঁচবে?

ডাঃ মিত্র।। জানি না আশিস। তবে দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত ফুলের মতো নিষ্পাপ একটি শিশু যখন জন্মদিনে আমার দীর্ঘায়ু কামনা করে—তখন তাকে এছাড়া আমি কি-ই বা বলতে পারি।

আশিস।। এমন অভিনয় করতে আপনার কষ্ট হয় না।

ডাঃ মিত্র।। অভিনয় নয় আশিস—এটা আমাদের ডিউটি। মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠদের সবাই যে সান্ত্বনা দেয়—তাতে তো মৃত ব্যক্তি আর ফিরে আসে না, কিন্তু শোকার্তরা শোক কাটিয়ে আবার জীবনযুদ্ধে নামার প্রেরণা পায়—এটা কি অভিনয়।

আশিস।। কিন্তু মিথ্যে সান্ত্বনায় তো আর রোগ সারে না।

ডাঃ মিত্র।। জানি সারে না। কিন্তু ডাক্তারের আশ্বাসবাণীতে মৃত্যুপথযাত্রী রোগীরা আবার নতুন করে বাঁচবার প্রেরণা পায়। এটাই বা কম কিসের! বয়সটা তোমার কম আশিস। আমার মতো চুল পাকুক, বয়স বাড়ুক—তখন বুঝবে রোগীর কাছে ডাক্তারের স্থানটা কোথায়। চল।

ডাঃ মিত্র ও আশিস করিডোর ধরে এগিয়ে যায়। দৃশ্য শেষ।

দৃশ্য ১৪ ।। হাসপাতাল-সংলগ্ন বাগান। সময় ❑ বিকেল।

হাসপাতালের মধ্যেই একটি বাগানের বেঞ্চে বসে আছে সৌম্য ও রিক্তা। সৌম্যর

হাতের মধ্যে ধরা রিক্তার দুটো হাত।

সৌম্য।। গতকাল তোমার যা অবস্থা দেখে গেলাম, ভাবিনি আজ তুমি আমার সঙ্গে হেঁটে এসে এখানে বসতে পারবে।

রিক্তা।। অনেক কিছুই তুমি ভাবনি, তবু সেগুলো ঠিকঠাক ঘটে যাচ্ছে, তাই না সৌম্য?

সৌম্য।। যেমন?

রিক্তা।। এই যে আমি তোমার কথামতো এখানে এলাম, বায়োপসি হল, বোর্ড হল, ভর্তি হলাম, চিকিৎসা হচ্ছে।

সৌম্য।। সবই হচ্ছে—তবে আরও আগে এগুলো হলে ভাল হত।

রিক্তা।। কী ভাল হত! আমি সম্পূর্ণ সেরে উঠতাম?

সৌম্য।। নিশ্চয়ই।

রিক্তা।। না, সৌম্য তুমি ভাগ্য মানো না, আমি মানি। আমার ভাগ্যে সুখ কথাটা বিধাতা লিখতে ভুলে গেছেন। যতই চিকিৎসা করো আমি সেরে উঠব না। আমার রোগটা কোন স্টেজে তা আমি জানি। আর আর্লি স্টেজে এ-রোগ সবার ভাল হয় বুঝি।

সৌম্য।। এখন তর্ক করার সময় নয় রিক্তা।

রিক্তা।। তর্ক তো করতে চাই না। তবে তোমার জন্য নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হয়। কেন আমার জীবনের সঙ্গে তোমাকে জড়ালাম বল তো!

সৌম্য।। আবার সেই এক কথা।

রিক্তা।। না সৌম্য এখানে ভর্তি হওয়ার পর থেকে মনে হচ্ছে, তুমি একটা আলাদা মানুষ। নিজের মতো করে বাঁচার অধিকার তো তোমারও আছে—তা থেকে তোমায় আমি বঞ্চিত করছি কেন?

সৌম্য।। ও—, আবার সেই পাগলামি শুরু করলে—

রিক্তা।। পাগলামি নয় সৌম্য। তুমি অনুকেই বিয়ে করো। ও এখনও তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। আমার মতো একটা মেয়ে, যে আর কয়েক দিন বাদেই মারা যাবে, তার জন্য নিজেকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছ কেন?

সৌম্য।। (হাত ধরে বলে) প্লিজ-প্লিজ—রিক্তা, একটু চুপ করো। এতো ইমোশনাল হয়ে পড়লে তোমার আরও শরীর খারাপ হবে।

রিক্তা।। ইমোশন নয় সৌম্য, আমি যা বলছি ভেবেচিন্তেই বলছি। এ-মাসের ৩০ তারিখ আমাদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, তোমার মনে আছে?

সৌম্য।। মনে আছে।

রিক্তা।। ওই দিনই তুমি বিয়ে কর। আমি আর সপ্তাহ তিনেক নিশ্চয়ই বেঁচে থাকব। তোমাদের বিয়েটা দেখে যেতে চাই। এই দু'বছর আমার অনেক অন্যায় আবদার তো সহ্য করেছ—মৃত্যুপথযাত্রীর এই শেষ অনুরোধটা রাখবে না!

রিক্তা কথাগুলো হাঁপাতে হাঁপাতে বলে। ক্লোজ-আপে সৌম্যর মুখের এক অদ্ভুত অভিব্যক্তি ধরা পড়ে। উঠে দাঁড়ায় সৌম্য। ধীরে ধীরে রিক্তাও উঠে দাঁড়ায়।

রিক্তা।। কী হল, কোনও কথা বলছ না যে।

সৌম্য।। তোমার অনুরোধ আমি রাখব, রিক্তা।

রিক্তা।। তার মানে ৩০ তারিখ তুমি বিয়ে করছ।

সৌম্য।। হ্যাঁ। কিন্তু—

রিক্তা।। কিন্তু!

সৌম্য।। পাত্রী হবে তুমি।

রিক্তা।। (আর্তনাদ করে ওঠে) সৌম্য।

শার্পকাট করে দেখা যায় পর্দায় আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের ঢেউ। দৃশ্য শেষ।

। দৃশ্য ১৫ ।। হাসপাতালের ফিমেল ওয়ার্ড। সময় ❑ রাত্রিবেলা।

পর্দায় সুতপার নাচের দৃশ্য। পুরো দেহ তারপর নৃত্যরতা দুটো পা। হঠাৎ পা দুটো কঙ্কালের পা হয়ে যায়। দু'পায়েই মল বাজে। তিরিশ সেকেন্ড দৃশ্যটি স্থায়ী হবার পর হঠাৎ ঘুম ভেঙে আর্ত চিৎকার করে ওঠে সুতপা।

সুতপা।। না-না, কিছুতেই না, আমার পা'টাকে তোমরা কেটে বাদ দিও না—আমার পা'টাকে—

ছুটে আসে রিক্তা। একটু বাদে সিস্টার ও আরও দু'-একজন।

রিক্তা।। সুতপা-সুতপা—কী হয়েছে তোমার। চিৎকার করে উঠলে কেন! স্বপ্ন দেখছিলে?

সুতপা।। রিক্তাদি (কেঁদে ফেলে), আমার পা'টা ওরা কাল কেটে বাদ দিয়ে দেবে—আমি আর নাচতে পারব না—আমার আর বেঁচে থেকে কি হবে!

রিক্তা।। পাগলি মেয়ে—যেটা হবার সেটা তো হবেই—প্রাণটা আগে বাঁচুক। স্যার কি বলে গেল আজ সকালে—ভুলে গেলে—

সুতপা।। আমার বড় ভয় করছে রিক্তাদি। বড় ভয়। তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না—তুমি আমার সঙ্গে থাকো।

রিক্তা।। বেশ তো—আমি থাকব। তুমি একটু সরে শোও—আমি তোমার

পাশে শুচ্ছি। সিস্টার বেড থেকে আমার বালিশটা এনে দেবেন।

সিস্টার বালিশ এনে দেয়। রিক্তা বালিশে হেলান দিয়ে বেডে আধশোয়া হয়ে বসে। সুতপা রিক্তার কোল ঘেঁষে গুটিসুটি মেরে শোয়। অন্যরা সরে যায়।

সিস্টার।। কোনও ভয় নেই। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি তুমি ঘুমিয়ে পড়। আপনি নিজেও তো অসুস্থ। আমি যদি ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিই।

রিক্তা।। কিন্তু ও যে আমাকেই চাইছে। আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। বড় লাইটটা অফ করে দিয়ে আপনি রেস্ট নিতে যান। আমি ওর দিকে খেয়াল রাখব।

সিস্টার লাইট অফ করে বেরিয়ে যায়। দৃশ্য শেষ।

● দৃশ্য ১৬ ।। ফিমেল ওয়ার্ড। সময় ❑ সকাল।

রিক্তা বেডে বসে বই পড়ছে। ঘরে ঢোকে দাদু।

দাদু।। গুড মর্নিং ম্যাম। ভেরি ভেরি গুড মর্নিং।

রিক্তা।। গুড মর্নিং মিস্টার প্রেসিডেন্ট।

দাদু।। অ্যাঁ! তুমি আমায় চিনে ফেলেছ!

রিক্তা।। এখানে সবাই আপনাকে চেনে। আপনি পেশেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট না। তাছাড়া রোজ বাগানে আপনাকে মর্নিং ওয়াক করতে দেখি। বসুন বসুন।

দাদু টুলে বসে। রিক্তা বেডের ওপর বৃদ্ধর মুখোমুখি বসে।

দাদু।। প্রেসিডেন্টই বটে। তবে স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট। আসলে কি জানো, মাস দেড়েক তো এখানে রয়েছি। প্রথম প্রথম সময় কাটতে চাইত না। কি করি। ডাঃ মিত্রকে বললাম। উনি বললেন, আপনি সব বেড়ে ঘুরে ঘুরে পেশেন্টদের সুখ-দুঃখের কথা শুনে আমাকে রিপোর্ট করবেন। আর সকালে বাগান পরিচর্যার তদারকি করবেন।

রিক্তা।। বেশ মজার চাকরি তো!

দাদু।। হ্যাঁ মজারই তো। তবে কি জানো, কেউ আমাকে তার দুঃখের কথা বলতেই চায় না—শুধু সুখের কথাই বলে।

রিক্তা।। এমন একটা অসুখ বয়ে বেড়াচ্ছে এই হাসপাতালের সবাই, তবু তাদের এত সুখ-আহ্লাদ আসে কোথায় থেকে!

দাদু।। আমিও তাই ভাবি। এই আমার কথাই যদি ধরো, রাইট লাঙে মার্বেল সাইজের ম্যালিগন্যান্ট টিউমার। অপারেশন হবে না রেডিয়েশন—এই নিয়ে ডাক্তারদের মধ্যে টাগ অব ওয়ার। শেষে শুধু রেডিয়েশনেই টিউমার ভ্যানিশ।

রিক্তা।। আশ্চর্য ব্যাপার!

দাদু।। মোটেই আশ্চর্য নয়। এই রোগে আজকাল অনেকেই ভাল হয়ে যাচ্ছে। আর্লি ডায়াগনোসিস, ট্রিটমেন্ট—এগুলো তো আছেই—কিন্তু সবার আগে দরকার মনের জোর। আমি বাঁচব, আমাকে বাঁচতে হবেই—এই মনোভাব। আমি শুধু সবার কাছে ঘুরে ঘুরে তাদের মনের জোরটুকুকে বাড়ানোর চেষ্টা করি।

রিক্তা।। আমার বেলায় আপনি ব্যর্থ হবেন।

দাদু।। কেন মা, কেন ব্যর্থ হব? তুমি বাঁচতে চাও না।

রিক্তা।। আপনি চান?

দাদু।। অফ কোর্স।

রিক্তা।। এই বয়সেও!

দাদু।। কত বয়স আমার, সবে তো আটের ঘরে পা দিলাম।

রিক্তা।। এই বয়সেও কেন বাঁচতে চান। জীবনের কাছে আর আপনার কী চাইবার আছে।

দাদু।। ভালবাসা-স্নেহ-মমতা। আমাদের কবি কী বলছেন—মনে নেই—মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই। আমিও তাই চাই। ছেলে-ছেলে বউ, নাতি-নাতনি নিয়ে আমার

সোনার সংসার।

রিক্তা।। ওরা সবাই আপনাকে ভালবাসে?

দাদু।। বাপ্‌রে বাপ! ভালবাসা কি বলছ, বল অত্যাচার। আর ছোট নাতিটা আমাকে ঘোড়া বানিয়ে আমার পিঠে চেপে বসে বলবে—এই ঘোড়া হ্যাট হ্যাট হ্যাট।

রিক্তা।। আপনি ভাগ্যবান। জীবনে বহুজনের ভালবাসা পেয়েছেন, দিয়েছেন।

দাদু।। তুমি পাওনি?

রিক্তা।। না। (দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে)

দাদু।। তবে ওই সুন্দর মতো ছেলেটা দিনের পর দিন তোমার জন্য জীবনপণ বাজি রেখে লড়াই করছে কেন?

রিক্তা।। আপনি সৌম্যকে চেনেন!

দাদু।। অফ কোর্স। মিস্টার প্রেসিডেন্টকে যে সবাইকেই চিনতে হয়।

রিক্তা।। ওর জন্যই তো আমি মরেও মরতে পারছি না।

দাদু।। ছিঃ, মা। মরার কথা বলছ কেন, বলো আমি বাঁচব।

রিক্তা।। আমি তো মরেই ছিলাম দাদু, ওই তো আমাকে বাঁচার লোভ দেখালো—যখন সত্যি করে বাঁচার কথা ভাবলাম—এই কালান্তক রোগ ছোবল মারল আমাকে—আমি কী করব!

কান্নায় ভেঙে পড়ে রিক্তা। দাদু মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়।

দাদু।। ভালবাসবে। নিজেকে—সৌম্যকে—সবাইকে। যতদিন বেঁচে আছো আনন্দে থাক, পারো তো অন্যকেও আনন্দ দাও।

রিক্তা।। (কাঁদতে কাঁদতে) আপনি জানেন, সৌম্য সব জেনেও আমাকে বিয়ে করতে চায়। এই অবস্থায় আমি কী করব?

দাদু।। বিয়ে করবে।

রিক্তা।। এ আপনি কী বলছেন। আপনি জানেন আমার ডেজ আর নাম্বারড্।

দাদু।। বেশ তো, যে ক'টা দিন আছো—আনন্দে থাক। তোমাকে বিয়ে করে সৌম্য যদি আনন্দ পায়—অমত করো না। ও তো তোমাকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে। সেই ভালবাসাটুকুর মর্যাদা দাও।

রিক্তা।। আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশি জীবনকে দেখেছেন—আপনি একথা বলছেন!

দাদু।। বলছি শুধু নয়, মনে করো এটা প্রেসিডেন্টের আদেশ।

রিক্তা।। আজ রাতটা ভেবে দেখি, কাল আপনাকে জানাবো।

দাদু।। তাহলে কাল সকাল আটটার মধ্যেই আমার কেবিনে চলে এসো। ন'টায় আমার ছুটি হয়ে যাচ্ছে। বাড়ির সবাই আসবে আমায় নিতে। ছেলে-বউমা, নাতি-নাতনি কত যে আনন্দ হবে। এই আনন্দযজ্ঞে তোমারও নেমতন্ন রইল। তাহলে আজ আসি মা।

বৃদ্ধ টুল ছেড়ে উঠে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়। রিক্তা তাকিয়ে থাকে।

দৃশ্য ১৫ ।। হাসপাতাল-সংলগ্ন বাগান। সময় ❑ বিকেল।

হাসপাতাল-সংলগ্ন বাগানের পার্কের বেঞ্চে পাশাপাশি বসে রিক্তা ও সৌম্য।

সৌম্য।। সিদ্ধান্ত জানাতে তুমি ৪৮ ঘণ্টা সময় চেয়েছিলে। (ঘড়ি দেখে) সময় কিন্তু হয়ে এলো।

রিক্তা।। সিদ্ধান্ত আমি সকালবেলাই নিয়েছি।

সৌম্য।। কী সিদ্ধান্ত নিলে?

রিক্তা।। নেগেটিভই ভেবেছিলাম, কিন্তু—

সৌম্য।। কিন্তু!

রিক্তা।। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, যাঁকে এখানে সবাই প্রেসিডেন্ট দাদু বলে, তিনিই আমার মনের মধ্যে ঝড় তুলে নেগেটিভটাকে পজিটিভ করে দিলেন।

সৌম্য।। কীভাবে?

রিক্তা।। দাদু বললেন, জীবনকে ভালবাস, সেও তোমাকে ভালবাসা ফিরিয়ে দেবে। যে ক'টা দিন আছো আনন্দে থাক। ভালবাসো নিজেকে। সৌম্যকে। সবাইকে। কথাগুলো কি অসাধারণ, তাই না! সৌম্য, শেষের কবিতার সেই লাইনগুলো তোমার মনে আছে—তুমি আর আমি একসাথে মাঝে মধ্যে আবৃত্তি করতাম—

সৌম্য।। আমার কিছুই মনে নেই। তোমার আছে?

রিক্তা।। মোর লাগি করিও না শোক
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই—

শেষ দু'লাইনে সৌম্যও গলা মেলায়। দৃশ্য শেষ।

দৃশ্য ১৬ ।। ডাঃ মিত্রর চেম্বার। সময় ❑ সন্ধ্যা।

ডক্টর্স চেম্বার। চেয়ারে বসে ডাঃ আশিস আচার্য। উল্টো দিকে দুটো চেয়ারে পাশাপাশি বসে সৌম্য ও রিক্তা। পাশে দাঁড়িয়ে সিস্টার।

আশিস।। যা বলছেন বেশ ভেবেচিন্তে বলছেন তো!

সৌম্য।। আটচল্লিশ ঘণ্টা টানা ভেবেছি। দুজনেই।

রিক্তা।। আসলে স্যারকে অ্যাপ্রোচ করার মতো সাহস আমাদের নেই—তাই আপনার মাধ্যমে।

আশিস।। স্যার ভীষণ ভালমানুষ—আপনারা বললেও উনি না করবেন না। তবে ৩০ তারিখ তো, আঠারো-উনিশ দিন বাকি। তখন তো ওনার রে চলবে।

সৌম্য।। ঘণ্টা কয়েকের জন্য ছুটি পাওয়া যাবে না—

আশিস।। দেখছি স্যারকে বলে। তা না হলে এখানেই ব্যবস্থা করতে হবে।

সৌম্য।। ব্যাপারটা সিরিয়াসলি দেখবেন।

আশিস।। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। কালকেই আমি স্যারের সঙ্গে কথা বলব।

রিক্তা।। (উঠে দাঁড়ায় দুজনে) আমরা তাহলে—

আশিস।। হ্যাঁ, আসুন। (দুজনে বেরিয়ে যায়)

সিস্টার।। একটু বসি ডাঃ আচার্য। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপ ধরে গেল।

আশিস।। হ্যাঁ, বসুন না। (সিস্টার বসে)

সিস্টার।। বিয়ের ঘটকালিও তাহলে শুরু করলেন।

আশিস।। আপত্তি কিসের?

সিস্টার।। না আপত্তি নেই। তবে ভাবছি আপনার বিয়ের ঘটকালিটা কে করবে।

আশিস।। কেন আপনি।

সিস্টার।। হ্যাঁ আমি! তাহলে পাত্রী কে?

আশিস।। কেন সিস্টার বর্ণালী।

সিস্টার।। অ্যাঁ। তাহলে আমার কী হবে!

সিস্টারের মুখের ক্লোজ-আপের ওপর শার্প কাট। দৃশ্য শেষ।

দৃশ্য ১৭ ।। হাসপাতালের কেবিন। সময় ⊔ সকাল।

হাসপাতালের কেবিনের বেডে শুয়ে আছেন দাদু। মৃত। বুক পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা। পাশে দাঁড়িয়ে ডাঃ আচার্য, জনা তিনেক সিস্টার ও অন্য দু'-একজন। ঝড়ের মতো ঢোকে রিক্তা।

রিক্তা।। এ কি! (এগিয়ে আসে) দাদুর যে আজ বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল। না-না এ অসম্ভব। দাদু যে আরও অনেকদিন বাঁচতে চেয়েছিল—

আশিস।। ভোররাতে ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন।

রিক্তা ধীরে ধীরে টুলে বসে। বুকের ওপর কান্নায় ভেঙে পড়ে। নেপথ্যে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে :

জীবনকে ভালোবাসো। সেও তোমাকে ভালোবাসা ফিরিয়ে দেবে। এ-বয়সেও আমার ভারি বাঁচতে ইচ্ছে করে মা। ছেলে-ছেলের বউ, নাতি-নাতনি নিয়ে আমার সুখের সংসার। কাল আমার ছুটি। সবাই আসবে আমায় নিতে। কি যে আনন্দ হবে না। এই আনন্দযজ্ঞে তোমারও নেমন্তন্ন রইল।

ওপরের কথাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বৃদ্ধের মুখের ক্লোজ-আপ এবং উপস্থিত অন্যান্যদের মুখের ক্লোজ-আপ দেখা যাবে।

দৃশ্য ১৮ ।। সৌম্যর অফিসঘর। সময় দুপুর।

অফিসঘরে দু'-চারটে টেবিল-চেয়ার, ফাইলপত্র, টাইপরাইটার। একটা চেয়ারে বসে টেবিলে রাখা টাইপরাইটারে টাইপ করছে সৌম্য। পাশের টেবিল থেকে এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়ায় শঙ্কর ও কুশল।

সৌম্য।। (টাইপ করতে করতে) কিছু বলবি?

শঙ্কর।। কেমন আছে রিক্তা?

সৌম্য।। ওই একই রকম।

কুশল।। পিঠে যে ব্যথাটা হচ্ছিল, কমেছে?

সৌম্য।। কমিয়ে রাখা হয়েছে পেইন কিলার দিয়ে।

শঙ্কর।। বোন স্ক্যান কবে হবে?

সৌম্য।। কাল সকালে।

শঙ্কর।। (পাশে চেয়ার টেনে বসে) একটা কথা শুনলাম, কথাটা কি ঠিক?

সৌম্য।। কী কথা, না জেনে বলব কেমন করে?

কুশল।। তুই নাকি এই অবস্থায় রিক্তাকে বিয়ে করতে চাইছিস।

সৌম্য।। হ্যাঁ পরশু। হাসপাতালের বোর্ডরুমে। দুপুর ১২টায়।

শঙ্কর।। আর ইউ ম্যাড?

সৌম্য।। আমায় দেখে কি তাই মনে হচ্ছে?

শঙ্কর।। বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছে না ঠিকই—কিন্তু ভেতরে ভেতরে তুই—

কুশল।। কেন এমন পাগলামি করছিস?

সৌম্য।। ভালবাসা মানেই তো পাগলামি। (কুশলের দিকে তাকিয়ে) তুই নাটকটা ভালবাসিস বলেই তো সেটা নিয়ে পাগলামি করিস—তাই না।

শঙ্কর।। কথা ঘোরানোর চেষ্টা করিস না। তুই নিজেই বলেছিস, রিক্তার দেহের অন্য জায়গাতেও রোগটা ছড়াচ্ছে তবু তুই ওকে বিয়ে করবি।

সৌম্য।। হ্যাঁ, করব।

কুশল।। বাট সি ইস ডেসটিন্‌ড টু ডাই।

সৌম্য।। এভরিবডি ইস ডেসটিন্‌ড টু ডাই ইন দিস ওয়ার্ল্ড।

শঙ্কর।। তুই তো ফিলোজফারের মতো কথা বলছিস।

সৌম্য।। লাভ অ্যান্ড ফিলোজফি একই মুদ্রার এ-পিঠ আর ও-পিঠ।

কুশল।। ট্রাই টু রিয়ালাইস সৌম্য, রিক্তা আমাদের সবারই খুব প্রিয়—আমরা সবাই সাধ্যমতো চেষ্টা করছি ওর জন্য—

সৌম্য।। আমি সেজন্য তোদের কাছে সবসময়েই গ্রেটফুল।

শঙ্কর।। সৌম্য তুই আরেকবার ভেবে দেখ, লাইফ ইজ নট গেম।

সৌম্য।। জানি আর সেজন্যই আগামী পরশু রিক্তাকে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করছি। পারলে আসিস। ভাল লাগবে। রিক্তাও খুশি হবে। চলি। হাসপাতালে যাবার সময় হয়ে গেছে।

সৌম্য ধীরে ধীরে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে যায়। শঙ্কর ও কুশল ওর যাত্রাপথের দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে। দৃশ্য শেষ।

দৃশ্য ১৯ ।। হাসপাতালের বোর্ড রুম। সময় ❑ দুপুর।

একটি টেবিলের চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছেন মিঃ খান (রেজিস্ট্রার), ডাঃ আশিস আচার্য, দু'জন সিস্টার, ফোটোগ্রাফার। টেবিলে ছড়ানো রয়েছে ফাইল, প্যাড, পেন ইত্যাদি।

মিঃ খান।। এ জীবনে তো কম বিয়ে দিইনি। যে যেমন চায় তাকে তেমন বিয়ে দিয়ে দি।

আশিস।। ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হল না।

মিঃ খান।। কোনও ব্যাপারই আপনার একবারে বোধগম্য হয় না, ভাগ্যিস এ-লাইনে আসেননি, না খেয়ে মরতেন।

সিস্টার-১।। না খেয়ে মরবে কেন?

মিঃ খান।। আরে মশাই আমাদের লাইনে বুদ্ধি বেচে খেতে হয়। এই যে আমি মিঃ খান, ম্যারেজ রেজিস্ট্রার, গভঃ অব ওয়েস্ট বেঙ্গল—

সিস্টার-২।। মিঃ খান, তার মানে আপনি—

মিঃ খান।। ধুর মশাই আমি কাজি নই। খান আমাদের উপাধি—পারিবারিক উপাধি। আমার দাদুর দাদুর দাদু—

আশিস।। আলিবর্দি খাঁ সাহেবের কাছ থেকে এই উপাধি পেয়েছিলেন।

মিঃ খান।। আপনি জানলেন কী করে?

আশিস।। পরশু দিন যখন আপনাকে বায়না করতে গিয়েছিলাম, তখন আপনি প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে এইসব সাতকাহন আমাকে শুনিয়েছিলেন।

মিঃ খান।। তাই বলুন। কিন্তু এরা তো জানে না। আরেকবার বলি।

আশিস।। না। তার চেয়ে ফাইল খুলে একবার দেখে নিন ফর্ম-টর্ম ঠিকঠাক এনেছেন কি না।

মিঃ খান।। কি যে বলেন না। শুধু কি ফর্ম, নারায়ণশিলা, শাঁখা, সিঁদুর, সব এনেছি। প্লাস্টিকের ফুলের মালাও আছে। (সঙ্গের ঝোলা ব্যাগ দেখায়)

সিস্টার-১।। কেন? কেন?

মিঃ খান।। কখন কি প্রয়োজন হয় বলা কি যায়! শুধু কাগজে-কলমের বিয়েতে অনেকে সন্তুষ্ট নয়—তখন দু'রকম বিয়েই দিয়ে দি। আসলে কি জানেন মশাই, দু'ভাবে বিয়ে দিলে দেখেছি বিয়ে খুব পোক্ত হয়।

সিস্টার-২।। আপনার বিয়েটা কীভাবে হয়েছিল?

মিঃ খান।। কেন মশাই ব্যক্তিগত প্রশ্ন করেন? যে মিষ্টি বিক্রি করে, তাকে কোনওদিন মিষ্টি খেতে দেখেছেন?

আশিস।। তার মানে আপনি এখনও আনম্যারেড।

মিঃ খান।। পাত্র-পাত্রী তো এখনও এলো না।

আশসি।। কেন আপনিই তো পুঁথি-পাঁজি মিলিয়ে স্যারকে বলে এলেন ১২টা ১০ গতে বিবাহমণ্ডপে প্রবেশ করতে।

মিঃ খান।। এই দেখুন নিজে বলে নিজেই ভুলে গেছি।

আশিস।। ভাগ্যিস এ-লাইনে আসেননি—না খেয়ে মরতেন।

মিঃ খান।। আসিনি মানে! অফ সিজনে তো আমি বিকল্প চিকিৎসা করি।

সিস্টার-১।। মানে, আপনি ডাক্তার!

মিঃ খান।। হ্যাঁ গোপন রোগের। (খ্যাক-খ্যাক করে হাসে)

সিস্টার-২।। এই ব্যাপার! বিয়েটা তাহলে এবার করে ফেলুন।

দরজা ঠেলে প্রবেশ করেন ডাঃ মিত্র, সৌম্য ও রিক্তা। সবাই উঠে দাঁড়ায়।

মিঃ খান।। আসুন, স্যার, আমার পাশে আসন গ্রহণ করুন।

ডাঃ মিত্র মিঃ খানের বাঁ পাশে বসেন। আশিস আগে থেকেই ডান পাশে বসে আছে।

মামণি এখানে আপনি বসেন। বাবাজীবন মামণির পাশে বসেন।

সৌম্য ও রিক্তা মিঃ খান ও ডাক্তারদের বিপরীতে বসে। দু'জন সিস্টার দু'পাশে দাঁড়ায়। মিঃ খান ফাইল খুলে ফর্ম বার করে।

শুভলগ্ন সমাগত। কর্ম সম্পাদন করি।

মিঃ খান।। আপনি এখানটায় সই করুন।

একটা প্রিন্টেড ফর্ম এগিয়ে দেয় সৌম্যর দিকে। সৌম্য সই করে।

এবার রিক্তাদেবী আপনি এখানটায় করুন।

রিক্তার দিকে এগিয়ে দেয়। জায়গাটা দেখিয়ে দেয়। রিক্তা সই করে।

এবার স্যার আপনি আর ডাঃ আচার্য উইটনেস হিসেবে টিক মারা জায়গা দুটোতে সই করুন।

ডাঃ মিত্রর দিকে কাগজটা এগিয়ে দেয়। ডাঃ মিত্র সই করে আশিসকে দেয়। আশিস সই করে কাগজটা রেজিস্ট্রারকে ফিরিয়ে দেয়।

ব্যস্। সইসাবুদ শেষ। এবার দু'জনে বলুন, যদিদং হৃদয়ং মম/তদিদং হৃদয়ং তব।

রিক্তা ও সৌম্য দু'জনেই বলে।

হয়ে গেল বিয়ে। মালা-টালার ব্যবস্থা করেননি। অবশ্য হাসপাতালের মধ্যে এসব না করাই ভাল। কি বলেন ডাঃ মিত্র?

ডাঃ মিত্র।। মালা-মিষ্টি এগুলো হলে ব্যাপারটা খুব জমতো, তাই না।

ডাঃ মিত্র টেবিলের ওপর রাখা কলিং বেল টেপেন। হই-হই করে মিষ্টি আর মালা হাতে ঢুকে পড়ে শঙ্কর, কুশল, রানা। এগিয়ে আসে ওদের দিকে।

রানা।। মালা বদল ছাড়া বিয়ে হয় নাকি?

সৌম্য।। তোরা শেষপর্যন্ত এলি!

আশিস।। অনেক আগেই এসেছে। স্যার ওদের আগে ঢুকতে বারণ করেছিলেন সারপ্রাইজ দেবেন বলে।

রিক্তা।। স্যার, আপনি—আপনি—!

ডাঃ মিত্র।। আর আপনি-আপনি না করে মালাবদলটা সেরে ফেল।

মিঃ খান।। ফেল ফেল—সেরে ফেল। লগ্ন বয়ে যায়।

শঙ্কর।। হ্যাঁ-হ্যাঁ কুইক-কুইক। নে সৌম্য, ধর।

সৌম্যকে মালা দেয়।

কুশল।। এটা তোমার (রিক্তাকে মালা এগিয়ে দেয়)। না-না লজ্জার কিছু নেই। ধরো। (রিক্তা হাতে মালা নেয়)

রানা।। এবার সৌম্যর গলায় পরিয়ে দাও। দাও-দাও।

মিঃ খান।। মামণি দাও।

শঙ্কর।। কি হল রে সৌম্য তুই আগে দে, রিক্তা লজ্জা পাচ্ছে।

সৌম্য প্রথমে রিক্তার গলায় পরিয়ে দেয়। হই-হইয়ের মধ্যে রিক্তাও সৌম্যর গলায় পরিয়ে দেয়। ফোটোগ্রাফার ছবি তোলে। রেজিস্ট্রার উঠে দাঁড়িয়ে বলতে থাকেন।

মিঃ খান।। যদিদং হৃদয়ং মম/তদিদং হৃদয়ং তব।

ডাঃ মিত্র।। এবার সবাই চলো বোর্ড রুমে। মিষ্টিমুখ করে তারপর সবাই যাবে। চলো-চলো।

সবাই হই-হই করে দরজার দিকে এগোয়। ক্যামেরা প্যান করে টু শটে সৌম্য ও রিক্তাকে ধরে। দু'জন দু'জনের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। দৃশ্য শেষ। দৃশ্যটির মাঝখানে ডাঃ মিত্র, ডাঃ আচার্য, দু'জন সিস্টার, রেজিস্ট্রার, সৌম্য ও রিক্তার ক্লোজ-আপ যাবে।

● দৃশ্য ২০ ।। দীঘার সমুদ্রতীর। সময় ❑ বিকেল।

সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে। সৌম্য আপনমনে চিঠি লিখছে। অফ ভয়েসে সৌম্যর গলা ভেসে আসে।

জানেন ডাক্তারবাবু, আমাদের বিয়েতে কোনও শাঁখ বাজেনি, উলুধ্বনিও হয়নি। ওর বাসর হয়েছিল আপনার হাসপাতালের ফিমেল ওয়ার্ডের ১৯ নম্বর বেডে আর আমার গেস্ট রুমের ব্যালকনিতে, তারা-ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে।

দুটি দৃশ্যই পর্দায় দেখা যাবে। নেপথ্যে ভেসে আসবে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান—কেউ দেয়নি উলু, কেউ বাজায়নি শাঁখ।

আবার সৌম্যর অফ ভয়েস। এর কয়েকদিন পরেই রিক্তাকে রেডিয়েশন দেওয়া শেষ হল। আপনি ছুটি দিতে চাইলেন। আমি রিক্তাকে জিজ্ঞেস করলাম—

দৃশ্য ২১ ।। হাসপাতালের ফিমেল ওয়ার্ড। সময় ❑ সকাল।

রিক্তা বেডে হেলান দিয়ে বসে আছে। পাশের টুলে বসে আছে সৌম্য।

সৌম্য।। পরশু তোমার ছুটি।

রিক্তা।। জানি। দেখতে দেখতে প্রায় দেড় মাস কেটে গেল। এবার কোথায় নিয়ে যাবে আমায়?

সৌম্য।। যেখানে যেতে চাইবে।

রিক্তা।। সমুদ্র দেখাতে নিয়ে যাবে আমায়।

সৌম্য।। কেন নিয়ে যাব না। তুমি সমুদ্র ভালবাস?

রিক্তা।। জানি না। জীবনে আমি সত্যিকারের সমুদ্র তো দেখিনি।

সৌম্য।। তাহলে!

রিক্তা।। যা দেখেছি—সব সিনেমায়-টিভিতে—অথচ মনে হয় সমুদ্র আমার খুব চেনা—সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে আমার অনেক দিনের বন্ধুত্ব।

সৌম্য।। আর কী মনে হয়?

রিক্তা।। আর কিছু মনে হয় না। আসলে খুব ছোটবেলায় তো মা-বাবাকে হারিয়েছি। মায়ের মুখ আমার স্পষ্ট মনেও পড়ে না। অথচ প্রায়ই স্বপ্ন দেখতাম সমুদ্রের দু'কূল ছাপানো ঢেউ আমার মাকে একবার ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মাঝ সমুদ্রে আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে বালুকাবেলায়—কেন এমন দেখতাম বলো তো?

সৌম্য।। মা আর সমুদ্র—দু'জনকেই সমান ভালবাসো বলে।

রিক্তা।। হ্যাঁ—ঠিকই বলেছ—সমুদ্র আমায় টানে—তুমি আমাকে সত্যিকারের সমুদ্র দেখাবে?

সৌম্য।। কেন দেখাব না! আমি আজই দুটো পুরীর টিকিট কেটে ফেলছি। তার আগে স্যারের সঙ্গে একবার দেখা করে কনফার্মড জেনে নিই, পরশুই তোমার ছুটি হচ্ছে কি না।

রিক্তা।। তাহলে এখুনি যাও। স্যার আবার রাউন্ডে বেরোবে।

সৌম্য।। আমি ঘুরে আসছি।

সৌম্য বেরিয়ে যায়। দৃশ্য শেষ।

দৃশ্য ২২ ।। ডাঃ মিত্রর চেম্বার। সময় ❑ সকাল।

বসে আছেন ডাঃ মিত্র ও সৌম্য।

ডাঃ মিত্র।। সমুদ্র দেখতে চাইছে রিক্তা—বেশ। সেখানেই নিয়ে যাও ওকে।

সৌম্য।। তাহলে পুরীর টিকিট কেটে ফেলি, স্যার?

ডাঃ মিত্র।। পুরী! না-না, এখনই অতটা জার্নি ও করতে পারবে না।

সৌম্য।। তাহলে।

ডাঃ মিত্র।। দীঘা থেকে ঘুরে এসো।

সৌম্য।। দীঘা!

ডাঃ মিত্র।। হ্যাঁ। আমার বিশেষ পরিচিত এক ভদ্রলোকের একটি গেস্টহাউস আছে ওখানে। আমি ফোন করে সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কেয়ারটেকারও আমার পরিচিত। চিঠিও দিয়ে দেব।

সৌম্য।। আপনার কাছে আমার ঋণ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে জানি না কীভাবে শোধ করব।

ডাঃ মিত্র।। নাই বা করলে। ঋণ শোধ করলেই তো সম্পর্ক চুকে যায়। আসলে কি জানো, রিক্তাকে এখানে আমরা সবাই খুব ভালবাসি। বড় দুখী মেয়েটা। তোমার ভালবাসায় ওর জীবনের শেষ ক'টা দিন ভরে যাক, সেই প্রার্থনাই করি।

সৌম্য।। রে তো আজ শেষ হয়ে গেল। আর কিছু করা যাবে না—না!

ডাঃ মিত্র।। কেন করা যাবে না। কেমোথেরাপি হবে সপ্তাহ দুয়েক পর থেকে। দীঘা থেকে সোজা এখানে এসে ভর্তি হয়ে যাবে রিক্তা।

সৌম্য।। তাহলে কালকেই ছুটি।

ডাঃ মিত্র।। কাল নয়, পরশু। ভোরবেলাই বেরিয়ে পড়বে। আর পৌঁছেই একটা ফোন করে দেবে।

সৌম্য।। ওষুধপত্র!

ডাঃ মিত্র।। আমি আশিসকে বলে দেব। ও তোমায় সব বুঝিয়ে দেবে।

সৌম্য।। আমি তাহলে আসি স্যার।

ডাঃ মিত্র।। এসো।

উঠে দাঁড়ায় সৌম্য। দৃশ্য শেষ।

দৃশ্য ২৩ ।। হাসপাতাল-সংলগ্ন প্রাঙ্গণ। সময় ❑ সকাল।

একটি মারুতি ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটির একটু দূরেই সৌম্য, রিক্তা ও ডাঃ মিত্র। ওদের পেছনে ডাঃ আশিস আচার্য, দুজন সিস্টার ও জনা কয়েক রোগী। সৌম্য ও রিক্তা দুজনেই প্রণাম করে ডাঃ মিত্রকে।

ডাঃ মিত্র।। (দুজনকে আশীর্বাদ করে) ভাল থেকো।

রিক্তা।। ভাল থাকতেই তো চাই স্যার। কিন্তু—

ডাঃ মিত্র।। আজ আর কোনও কিন্তু নয়। মন খারাপ করবে না। ঘড়ির কাঁটা ধরে ওষুধ খাবে। আর দু'সপ্তাহ বাদে সোজা এখানে চলে আসবে।

রিক্তা।। যদি না আসতে পারি।

ডাঃ মিত্র।। আবার ওসব কথা! ওঠো ওঠো গাড়িতে ওঠো। তোমাদের সি অফ করতে কতজন এসেছে—দেখেছ।

(উপস্থিত সবাইয়ের একটি ক্লোজ শট ইনসার্ট হবে)

এঁরা সবাই তোমায় ভালবাসে। সেই ভালবাসার টানে তোমাকে ফিরে আসতেই হবে।

সৌম্য।। আসি স্যার! ওঠো।

রিক্তা উঠতে যায়। হঠাৎ ক্যামেরার ফ্রেমের বাইরে থেকে মাধুরীপিসির ডাক শুনে চমকে ওঠে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে রিক্তার চোখ-মুখ।

মাধুরী।। ও মেয়ে চললে কোথায়?

রিক্তা।। পিসি তুমি!

মাধুরী।। হ্যাঁ আমি। কোথায় যাওয়া হচ্ছে আমায় ফাঁকি দিয়ে। ওমা এ যে সিঁথিতে সিঁদুর। এরই মধ্যে বে হয়ে গেল! আমায় খবর দিলি নে।

রিক্তা।। কি করে দেব। তোমায় যে খুঁজেই পেলাম না। একদিন সকালে উঠে শুনলাম তুমি কোথায় চলে গেছ।

মাধুরী।। কোথায় আর যাব তোদের ছেড়ে। অকালকুষ্মাণ্ড ছেলে দুটো তো আমায় ভর্তি করে দিয়ে পেইলে গেল। আমারও মাথার ঠিক ছেলো না। বাড়িটা কোথায় তা-ই ভুলে গেছলাম। হঠাৎ একদিন ভোরে সব মনে পড়ে গেল। তোদের না বলে চুপিচুপি পেইলে গেলাম।

সৌম্য।। চলেই যদি গেলেন আবার ফিরে এলেন কেন?

মাধুরী।। চিকিচ্ছে করাব বলে। মাথাটায় মাঝে মাঝে যে বড় যন্ত্রণা হয়, চোখে ঝাপসা দেখি। তোদেরই প্রথম ভাল করে ঠাহর করতে পারছিলাম না।

রিক্তা।। কে করাবে তোমার চিকিৎসা?

মাধুরী।। কেন? সনাতন আর পঞ্চানন। আমার দুই ছেলে—

সৌম্য।। ওরাই তো আপনাকে এখানে ফেলে পালিয়েছিল? আবার যদি পালায়?

মাধুরী।। পালাবে না। ওরা ভুল বুঝতে পেরেছে। ওরাই তো আমায় আবার এখানে নিয়ে এল। বললে, তোমারে ভাল করে তবেই আমরা এখান থেকে ফিরব।

রিক্তা।। পিসি আমাদের আশীর্বাদ করবে না।

মাধুরী।। করব না! বলছিস কি! কেমন মানিয়েছে তোদের। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। তা হ্যাঁ রে, আমি তোদের গরিব পিসি। কিছু-ই তো নেই—কি দিয়ে মুখ দেখি।

সৌম্য।। আপনার দুটো চোখ দিয়ে।

মাধুরী।। তা বললে কি হয়! (আঁচলের খুঁট থেকে একটা মলিন পাঁচ টাকার নোট বার করে রিক্তার হাতে গুঁজে দেয়) এটা রাখ মা। আমার তো তোদের দেবার মতো কিছু নেই।

রিক্তা।। পিসি! (পিসির হাত দুটো ধরে আবেগ সামলানোর চেষ্টা করে) তুমি নিশ্চয়ই আমাদের আগের জন্মের কেউ ছিলে। আশীর্বাদ করো পিসি। যেন আবার ফিরে এসে তোমার দেখা পাই।

মাধুরী।। পাবি রে পাবি! যা। দেরি করিয়ে দিলাম। কোথায় বেড়াতে যাচ্ছিস—যা।

সৌম্য ও রিক্তা গাড়িতে উঠে বসে। সবাইকে হাত নেড়ে বিদায় জানায়। উপস্থিত সবাই প্রত্যুত্তরে হাত নাড়ে। গাড়ি ধীরগতিতে হাসপাতালের গেট ছেড়ে বেরিয়ে যায়। ক্লোজ শটে দেখা যায় ডাঃ মিত্রকে। চশমাটা খুলে কাঁচ দুটো মুছে নিয়ে আবার পরেন। মাধুরীপিসি এগিয়ে আসে ডাঃ মিত্রর দিকে।

মাধুরী।। (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে) মেয়েটা তো আর বাঁচবে না ডাক্তার?

ডাঃ মিত্র।। কে বলল বাঁচবে না!

মাধুরী।। আমি জানি। আচ্ছা ডাক্তার আমার প্রাণটা নিয়ে ওই কচি মেয়েটার প্রাণটা ফিরিয়ে দিতে পারো না তোমরা। বলো না ডাক্তার পারো না। বলো না, পারো না।

কান্নায় ভেঙে পড়ে। ডাঃ মিত্র পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে থাকেন। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ পর্দা জুড়ে।

দৃশ্য ২৪ ।। দীঘার একটি হোটেলের রিসেপশন কাউন্টার। সময় ❑ বিকেল।

প্রবেশ করে সৌম্য ও রিক্তা। সিট ছেড়ে উঠে এগিয়ে আসে কেয়ার টেকার সদানন্দ মাইতি।

সদানন্দ।। ওয়েলকাম স্যার, ওয়েলকাম ম্যাডাম। আপনাদের পদধূলিতে ধন্য

হোক আমাদের 'দু'দিনের তরে' গেস্ট হাউস।

সৌম্য।। আপনি নিশ্চয়ই সদানন্দবাবু?

সদানন্দ।। দয়া করে আমায় বাবু বলবেন না স্যার। আমি এখানকার সামান্য কেয়ার টেকার। আপনারা কত মান্যিগণ্যি লোক। ডাঃ মিত্র আমায় ফোন করে সব বলে দিয়েছেন। আপনারা এখানে বসুন স্যার।

সৌম্য।। (রিক্তাকে) তুমি বসো। (রিক্তা বসে)

সদানন্দ।। হ্যাঁ আপনার তো শরীরটা ভালো না—তার ওপর পাঁচ ঘণ্টার জার্নি। রিলাক্স করুন। বঙ্কা, বাবুদের মালগুলো গাড়ি থেকে নিয়ে দোতলায় ১৪ নম্বর ঘরে দিয়ে আয়। **(বঙ্কা মাল নিয়ে দোতলার দিকে এগোয়)**

রিক্তা।। ভারি সুন্দর নাম তো আপনাদের হোটেলের। দু'দিনের তরে। বেশ অর্থবহ নাম।

সদানন্দ।। আমাদের মালিকের ওয়াইফ মানে মালকিন এই নামটা রেখেছিলেন।

রিক্তা।। মালকিন এখানেই থাকেন?

সদানন্দ।। হ্যাঁ এই দীঘাতেই থাকতেন। তবে গত বছর গত হয়েছেন। যান এবার ঘরে যান। আমি নিজে হাতে সাজিয়েছি। একেবারে সি ফেসিং হনিমুন সুইট। আশা করি পছন্দ হবে। দোতলায় উঠেই ডানদিকের প্রথম ঘর।

সৌম্য।। চলো।

সৌম্য এগোয়। রিক্তা কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে একটা ওষুধের প্যাকেট বার করে সৌম্যর অলক্ষ্যে ওয়েস্ট বক্সে ফেলে দেয়। তারপর এগিয়ে যায়। সদানন্দ প্যাকেটটা তুলে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে। দৃশ্য শেষ।

দৃশ্য ২৫ ।। হোটেলের ঘর। সময় ❑ বিকেল।

রিক্তা ঘরের সি ফেসিং দরজা খুলে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। দেখা যায় দূরে সমুদ্র। সৌম্যও পাশে এসে দাঁড়ায়।

রিক্তা।। অপূর্ব। যতদূর দেখা যায় শুধু জল আর জল। সমুদ্র যে এত সুন্দর হয়, আমি আগে জানতাম না।

সৌম্য।। সিনেমায় দেখনি।

রিক্তা।। দেখেছি। তবে এই প্রথম আমি সত্যিকারের সমুদ্র দেখলাম। কেমন নীল জল।

সৌম্য।। তোমার ভাল লাগছে।

রিক্তা।। ভীষণ—ভীষণ ভাল লাগছে। আমি এখন এই ব্যালকনিতে বসে বসে শুধু সমুদ্রই দেখব।

সৌম্য।। হাত-মুখ ধুয়ে রাস্তার পোশাক পাল্টে নিলে হত না—

রিক্তা।। পরে পাল্টাব। তুমিও বসো না আমার পাশে।

সৌম্য।। দু'কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে এসে বসছি।

সৌম্য ব্যালকনি থেকে ঘরে ঢুকে যায়। রিক্তা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সমুদ্রের দিকে। দৃশ্য শেষ।

দৃশ্য ২৬ ।। সি বিচ। সময় ❑ সন্ধ্যা।

লং শটে দেখা যায় সৌম্যর হাত ধরে ধীরে ধীরে সি বিচ ধরে হেঁটে আসছে রিক্তা। ক্যামেরার কাছাকাছি আসতেই বোঝা যায় রিক্তা হাঁপাচ্ছে। দাঁড়িয়ে পড়ে দুজনেই।

সৌম্য।। তোমার কষ্ট হচ্ছে রিক্তা—তাই না।

রিক্তা।। না, না, কষ্ট কিসের। এমন সুযোগ তো বারবার আসবে না!

সৌম্য।। তুমি হাঁপাচ্ছ। এসো এখানটায় বসি।

দুজনে বালিতে বসে। সৌম্য ফ্লাস্ক খুলে চা ঢেলে এক কাপ রিক্তাকে দেয়, নিজে এক কাপ নেয়।

রিক্তা।। কোথায় আমি তোমায় চা করে এগিয়ে দেব—আর তুমি কি না—

সৌম্য।। আমি কিছুই করিনি রিক্তা। সবই সদানন্দ করেছে। বেরোবার সময় ওই তো আমায় এটা ধরিয়ে দিল।

রিক্তা।। ভারি ভাল মানুষ। ভীষণ পরোপকারী।

সৌম্য।। শুধু তাই! তোমার জন্য ডাক্তার পর্যন্ত রেডি রেখেছে।

রিক্তা।। আবার ডাক্তার কেন সৌম্য। ডাক্তার, ওষুধ, হাসপাতাল, অসুখ— সব ভুলে থাকব বলেই তো এখানে এলাম।

দুজনে চুপচাপ সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে থাকে। নিস্তব্ধতা ভেঙে গুনগুন করে গান গেয়ে ওঠে রিক্তা—'যখন ভাঙল, ভাঙল মিলন মেলা ভাঙল।'

সৌম্য।। গলায় তোমার এখনও সুর আছে রিক্তা—কিন্তু এই গানটাই কেন বারবার গাও বলো তো?

রিক্তা।। ভাঙনের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি যে।

সৌম্য।। নিজেকেক না ভালবাসতে পারো আমার জন্যও কি তোমার এতটুকু করুণা হয় না।

রিক্তা।। হয়। তবে করুণা নয়। কষ্ট হয়—ভীষণ কষ্ট

সৌম্য।। কিসের কষ্ট?

রিক্তা।। (ধীরে ধীরে সৌম্যর চোখে চোখ রাখে) নিজেকে এভাবে ঠকালে কেন সৌম্য? কী পেলে? বলো না গো কি পেলে এই আত্মত্যাগে? বলো না—বলো না গো—

সৌম্য।। কিছু পাব বলে তো তোমাকে ভালবাসিনি রিক্তা! ঠকার প্রশ্ন আসছে কেন? আর আত্মত্যাগ! সেসব তো মহাপুরুষেরা করেন। ওই দেখ সদানন্দ আসছে।

হঠাৎ দেখা যায় এগিয়ে আসছে সদানন্দ। দু'হাতে দু'ঠোঙা ঝাল-মুড়ি। বাম কাঁধে একটি লেডিজ শাল।

সদানন্দ।। ধরুন, ধরুন। (দুজনে দু'ঠোঙা নেয়) এ হল সদানন্দের স্পেশাল ঝাল-মুড়ি। এটা আমার সাইড বিজনেস। দুটো পয়সা জমাচ্ছি। সামনের বছর বে করব।

রিক্তা।। তাহলে এখন থেকেই তো পাত্রী খুঁজতে হবে—

সদানন্দ।। ও ঠিক করাই আছে।

সৌম্য।। পরিচয় করাবে না আমাদের সঙ্গে।

সদানন্দ।। বলেছিলাম, লজ্জা পাচ্ছে। গাঁয়ের মেয়ে তো! ম্যাডাম, আপনার শাল। (শালটা রিক্তাকে দেয়) সন্ধে হয়ে এল। সমুদ্দুরের নোনা জলে ঠাণ্ডা লাগতে পারে। শালটা জড়িয়ে বসেন। আমি যাই।

সদানন্দ চলে যায়। দুজনে তাকিয়ে থাকে।

রিক্তা।। সদানন্দর মতো ছেলেকে স্বামী হিসেবে যে মেয়ে পাবে, সে সত্যিই ভাগ্যবান।

সৌম্য।। ভাগ্যবান নয়, ভাগ্যবতী। (দুজনেই হেসে ওঠে) চলো একটু হাঁটি।

সৌম্য রিক্তাকে ধরে দাঁড় করায়। দুজনে ধীরে ধীরে বিচ ধরে হাঁটতে থাকে। একটু এগিয়ে দেখে এক বৃদ্ধ দম্পতি অশক্ত দেহে পরস্পরের হাত ধরে হাঁটছে। রিক্তা ও সৌম্য দাঁড়িয়ে পড়ে। রিক্তা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বৃদ্ধ দম্পতি ওদের অতিক্রম করে চলে যায়। রিক্তা আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরে সৌম্যর হাত। সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে ওদের কাছে। সৌম্য শালটা জড়িয়ে দেয় রিক্তার গায়ে। দৃশ্য শেষ হয়ে যায়।

দৃশ্য ২৭ ।। হোটেলের ব্যালকনি। সময় ❑ সকাল।

রিক্তা ব্যালকনিতে একটি চেয়ারে বসে এক দৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছে। চেহারায় অসুস্থতার ছাপ স্পষ্ট। হঠাৎ মহিলা কণ্ঠের হাসি শুনে নিচে রিসেপশন কাউন্টারের দিকে তাকায়।

মালা।। (হাসতে হাসতে) খোল, খুলেই দেখ না টিফিনক্যারিটা। আজ একেবারে ইসপেশাল আইটেম।

সদানন্দ।। (টিফিনক্যারি খুলতে খুলতে) বাব্বা, তুমি যে ফটর-ফটর করে ইংরেজি বলছ গো। বাব্বা! এ তো পোলাও! (গন্ধ শুঁকে) কী খুশবু মাইরি।

মালা।। খেয়ে দেখ কেমন লাগে। একটু টেস্ট কর।

সদানন্দ।। তুমি খাইয়ে দাও।

মালা।। ইল্লি আর কি! কেউ যদি এসে পড়ে।

সদানন্দ।। কেউ আসবে না। দাও না। নইলে কিন্তু—

মালা এপাশ-ওপাশ দেখে এক চামচ পোলাও সদানন্দকে খাইয়ে দেয়।

সদানন্দ।। এবার তুমি একটু টেস্ট কর।

মালা আপত্তি করার আগেই সদানন্দ জোর করে এক চামচ পোলাও ঢুকিয়ে দেয় তার মুখে। মালা বিষম খায়। সদানন্দ হাসতে থাকে। রিক্তা অপলক দৃষ্টিতে পুরো দৃশ্যটি দেখে।

দৃশ্য ২৮ ।। হোটেলের ঘর। সময় ❑ মধ্যরাত।

হোটেলের বিছানায় শুয়ে আছে সৌম্য ও রিক্তা। হঠাৎ চাপা কান্নায় ঘুম ভেঙে যায় সৌম্যর। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে রিক্তা।

সৌম্য।। রিক্তা! রিক্তা! কি হয়েছে। কাঁদছ কেন?

রিক্তার মুখ নিজের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। রিক্তা আধশোয়া অবস্থায় সৌম্যর গলা জড়িয়ে ধরে

রিক্তা ।। আমি বাঁচতে চাই সৌম্য, আমি বাঁচতে চাই। এ আমি কি করলাম! শুধু মরব বলেই রোগটাকে নিজের শরীরে এভাবে বাড়তে দিলাম কেন? তোমার কথা কেন একবারও ভাবলাম না।

সৌম্য ।। সব ঠিক হয়ে যাবে রিক্তা। তুমি এমন করলে তোমার শ্বাসকষ্ট বাড়বে। এমন ছেলেমানুষি করো না।

রিক্তা ।। কিছুই আর ঠিক হবে না সৌম্য! আমি এতদিন শুধু মরণকেই ভালবেসে এসেছি। কিন্তু আজ যে আমার ভীষণ প্রেসিডেন্ট দাদুর কথা মনে পড়ছে—আমার যে বাঁচতে ইচ্ছে করছে—তোমাকে ভীষণ করে ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। এ আমি কি করলাম—

ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে রিক্তা। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে যায় সেই কান্নার শব্দে। গভীর রাতের নিকষ কালো নিস্তরঙ্গ সমুদ্র দেখা যায় পর্দা জুড়ে।

দৃশ্য ২৯ ।। হোটেলের ঘর। সময় ❑ রাত।

হোটেলের বেডে শুয়ে আছে রিক্তা। খুবই অসুস্থ। বুক পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। পাশে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন মুখে সৌম্য ও সদানন্দ। রিক্তার বুকটা হাঁপরের মতো ওঠা-নামা করছে।

সৌম্য ।। কী করি বলো তো সদানন্দ। ডাক্তারবাবু তো নার্সিংহোমে দিতে বললেন।

সদানন্দ ।। কোনও চিন্তা নেই। আমি তো আছি। আধঘণ্টার মধ্যে সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

রিক্তা ।। না-না—আমি নার্সিংহোমে যাব না। কী হবে ওখানে গিয়ে—

সৌম্য ।। কিন্তু এই অবস্থায় আর কলকাতায় নিয়ে যাওয়া যাবে না। তোমার গায়ে যে ভীষণ জ্বর, সকালে একবার বমিও করলে। এসময় ওষুধের বাক্সটাও পাচ্ছি না—

সদানন্দ ।। আমি ওষুধের ব্যবস্থা করছি। (বেরিয়ে যায়)

রিক্তা ।। (হাঁপাতে হাঁপাতে বলে) কী হবে আর ওষুধ দিয়ে। ওষুধ—ডাক্তার সব কিছুর বাইরে চলে যাচ্ছি আমি। সময় যে হয়ে এল। নাবিক এবার নোঙর তোলো। ডিঙা ভাসাও সাগরে।

সৌম্য ।। এরকম করো না রিক্তা! সদানন্দ ওষুধ আনতে গেছে। এখুনি চলে আসবে।

রিক্তা ।। (অনেক কষ্টে বলে) কোথায় পাবে ওষুধ। সব যে আমি ফেলে দিয়েছি। সৌম্য আমায় একটু ব্যালকনিতে নিয়ে গিয়ে বসাবে। আমি দু'চোখ ভরে সমুদ্র দেখব। ওই সমুদ্রের ঢেউয়ের মাঝে লুকিয়ে আছে

আমার মা। আমি বলব—মা, এই যে আমি এলাম, তুমি আমাকে নাও মা, তুমি আমাকে নাও। সৌম্য প্লিজ!

রিক্তা উঠে বসার চেষ্টা করে। চোখে অদ্ভুত ঘোলাটে দৃষ্টি। সৌম্য পাশে বসে শোওয়াবার চেষ্টা করে।

সৌম্য।। তুমি উঠতে পারবে না, রিক্তা। আমি সদানন্দকে ডাকি।

রিক্তা।। পারব, পারতে আমাকে হবেই। সমুদ্র আমাকে ডাকছে—আমায় বাধা দিয়ো না—

রিক্তা জোর করে উঠে পড়ে। সৌম্যকে জড়িয়ে ধরে অনেক কষ্টে ব্যালকনির সোফায় গিয়ে বসে। সমুদ্রের দিকে চোখ রাখতেই এক অনাবিল প্রশান্তি ফুটে ওঠে চোখে-মুখে। একটু বাদে বলে—

রিক্তা।। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে সৌম্য। তোমার কোলে মাথা রেখে একটু শুই।

রিক্তা সৌম্যর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। সৌম রিক্তার চুলে বিলি কেটে দেয়। প্রাণপণে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে।

রিক্তা।। আমায় ঘুম পাড়িয়ে দাও সৌম্য। সেই গানটা গাও, আমি এখুনি ঘুমিয়ে পড়ব।

সৌম্য।। (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) আমার গলায় যে গান আসছে না রিক্তা—

রিক্তা।। গাও না সৌম্য—জীবনে যত পূজা হলো না সারা—জানি হে জানি তাও হয়নি হারা—যে নদী মরুপথে হারালো ধারা—জানি হে জানি তাও—

সৌম্য।। রিক্তা তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে—

রিক্তা।। সৌম্য—সৌম্য—

রিক্তা সৌম্যর জামাটা বুকের কাছে খামচে ধরে মাথা তোলার চেষ্টা করে। পারে না। হাতের মুঠি শিথিল হয়ে যায়। সৌম্যর কোলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে রিক্তা। ঠিক সেই মুহূর্তেই ব্যালকনিতে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় সদানন্দ। বিস্ফারিত চোখে মৃত্যুর শেষ মুহূর্তটি দেখে। হাত থেকে পড়ে যায় ওষুধের প্যাকেট। দরজার ফ্রেম ধরে কাঁদতে কাঁদতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে সদানন্দ। উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়ে পর্দা জুড়ে। দৃশ্য শেষ।

দৃশ্য ৩০ ।। ডাঃ মিত্রর বাড়ি। সময় ❑ দুপুর।

ডাঃ মিত্র চিঠি পড়ছেন প্রথম দৃশ্যর মতো। পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর স্ত্রী তৃষা। ভেসে আসে সৌম্যর গলা।

'নিশ্চয়ই ভাবছেন তখন আমি কী করেছিলাম? না, ডাক্তারবাবু— আমি কোনও কান্নাকাটি করিনি। ওর মাথাটা আমার কোলে নিয়ে বসেছিলাম বেশ কিছুক্ষণ। হোটেলের কেয়ার টেকার সদানন্দই রিক্তার শেষ কাজের সব ব্যবস্থা করেছিল।

ডাক্তারবাবু, একটা শেষ অনুরোধ করব, রাখবেন? আপনাদের হাসপাতালে আমায় একটা কাজ দিতে পারেন? যে-কোনও কাজ। আপনারা সবাই ওখানে মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের জন্য লড়াই করেন। নিন না, সেই লড়াইয়ে আমাকেও শরিক করে। আগের জীবনে আমি আর ফিরতে চাই না স্যার। রিক্তা নেই, কিন্তু আরও অনেক ক্যানসার রোগী তো ওখানে আছে। ওদের জন্য আমি কি কিছুই করতে পারি না? প্রণাম নেবেন। স্নেহভাজন সৌম্য।'

ডাঃ মিত্র হঠাৎ বাঁ কাঁধে হাতের চাপ অনুভব করেন। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখেন তৃষার দু'চোখ বেয়ে নামছে জলের ধারা। নিজের ডান হাত তৃষার হাতের ওপর রাখেন ডাঃ মিত্র। মৃদু হেসে তৃষাকে সান্ত্বনা দেন। দৃশ্য শেষ। টাইটেল দেখানো শুরু হয়। ❑